হেমচন্দ্র

"উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্বপক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

—:*:—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

M. A., F. S. S., F. R. E. S.

বিরচিত।

—০—

প্রথম খণ্ড।

(১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ)

———

কলিকাতা।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মানসী প্রেস

১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

পিতৃদেবের

শ্রীচরণকমলে—

বিজ্ঞাপন

কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্ব্বে, অস্মদীয় পরম শ্রদ্ধা-ভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামক মাসিক পত্রের পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য আমাদিগকে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। বিষয়ের গুরুত্ব এবং আমাদিগের অক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা প্রথমে এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হই। হেমচন্দ্রের প্রতি চিরদিন আমাদের গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ কখনও পাই নাই, তাঁহার রচিত কাব্যাদি আমাদিগের অতিশয় প্রিয় হইলেও সেগুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ধৃষ্টতাপ্রকাশের বাসনা কখনও আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে যাঁহারা হেমচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন তাঁহারাই তাঁহার জীবন কথা সঙ্কলন করিবেন, যাঁহারা তাঁহার কাব্যাদি সমালোচনা করিবার যথার্থ অধিকারী, তাঁহারাই তাঁহার কাব্যাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

শুনিয়াছিলাম হেমচন্দ্রের একজন বন্ধু (?)—অক্ষয়চন্দ্র

সরকার—'কবি হেমচন্দ্র' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহা প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি তখনও আমরা পাঠ করি নাই। আমরা বন্ধুবরকে বলি যখন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হেমচন্দ্রের বিষয় লিখিয়াছেন, তখন তৎসম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু লিখিবার নাই। বন্ধুবর আমাদিগের হস্তে অক্ষয়বাবুর বইখানি গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "পড়িয়া দেখিবেন।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অক্ষয়বাবুর গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করি এবং পাঠ শেষে অত্যন্ত নিরাশ ও ব্যথিত হই। কারণ হেমচন্দ্রের চরিত্র ও কাব্যাদি সম্বন্ধে আমাদিগের যে ধারণা ছিল এবং সাধারণে যে মত প্রচলিত আছে, অক্ষয়বাবু এই গ্রন্থে তাহার বিরুদ্ধ অভিমত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া অনন্যতন্ত্রতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হেমচন্দ্রের কয়েক জন অকৃত্রিম বন্ধু এবং নিরপেক্ষ সমালোচকের সহিত অক্ষয়বাবুর অভিমত গুলির আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে হেমচন্দ্রের চরিত্র ও কাব্যাদি সম্বন্ধে আমাদিগের যে ধারণা ছিল তাহা অপ্রকৃত নহে। তখন আমাদিগের মনে হইল, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য

সমালোচক ও বন্ধুগণের অভিমত সমূহ সঙ্কলন করিবার আবশ্যকতা আছে এবং তাহা এক্ষণে সঙ্কলন না করিলে উত্তরকালে অক্ষয়চন্দ্রের গ্রন্থপাঠে অনেকেই হেমচন্দ্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমরা, আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব, হেমচন্দ্রের জীবন ও কাব্যাদির বিবরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবন্ধরচনারম্ভের অনতিকালপরেই অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমরা ইচ্ছামত অনুসন্ধান করিয়া আশানুরূপ তথ্যসংগ্রহ করিতে পারিলাম না, এ ক্ষোভ আমাদিগের রহিল।

যাঁহারা আমাদিগকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যর জন উড্রফ, শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার, শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন,

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ প্রভৃতির নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।

হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা মেদিনীপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইয়াছি। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও দৌহিত্র সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অনিল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাদিগকে উপকরণ ও চিত্র সংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের বাসস্থান খিদিরপুরে কতিপয় উন্নতমনা ও উৎসাহশীল যুবক কবিবরের স্মৃতি রক্ষার্থ 'হেমচন্দ্র পাঠাগার' নামক একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। ইঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের একটি জীবন চরিত প্রকাশিত করিবার জন্য বিস্তর উপকরণ সংগ্রহ করেন। সেই সকল উপকরণ এবং কবিবরের অপ্রকাশিত কবিতা এবং পত্রাদি কোন সাহিত্যিককে

প্রদান করা হয়। তিনি জীবন চরিত সঙ্কলন করা দূরে থাকুক উপকরণগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই যুবকগণের উৎসাহ অদম্য। তাঁহারা পুনরায় উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে সফল হন; এবং ৺প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবক সেগুলি লইয়া হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের একটি খস্ড়া প্রস্তুত করেন।

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে আমরা যখন হেমচন্দ্রের জীবন চরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ মানসে প্রথম খিদিরপুরে গমন করি, তখন আমাদিগের পরিচিত কেহই সেখানে ছিলেন না। হেমচন্দ্রের প্রিয়বন্ধু স্বনামধন্য ৺উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি আমাদিগের সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠাগারের কতিপয় সদস্যকে আহ্বান করিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করেন। আমরা ইঁহাদিগের একান্ত অপরিচিত হইলেও তাঁহারা আমাদিগের সহিত নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেন, আমাদিগের উদ্বাহুবামনের ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা উপহাস না করিয়া উৎসাহবারি

সেচন করেন, এবং আমাদিগের অক্ষমতার প্রমাণ পাইয়াও তাঁহারা তাঁহাদিগের সংগৃহীত উপকরণগুলি এবং প্রবোধ বাবুর খসড়াটি যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে না দিয়া আমাদিগকে প্রদান করেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও সদয় ব্যবহার কখনও বিস্মৃত হইবার নহে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবেও আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতাকে লিখিত কতকগুলি অমূল্য পত্র আমাদিগকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং তাঁহার পিতার ডায়েরি হইতে হেমচন্দ্রের জীবনের কতকগুলি ঘটনার তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্রও তাঁহার সংগ্রহ হইতে পাইয়াছি।

খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণও আমাদিগকে উপকরণাদি সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিকটেই আমরা ঋণী। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-লেখক বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের ঋণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ দে মহাশয়গণের গার্হস্থ্য পুস্তকাগার হইতে আমরা অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট আমরা অশেষ ঋণী। বর্ত্তমান প্রস্তাব 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবার সময় উহার সম্পাদনে ইঁহারা যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন। এই গ্রন্থের চিত্রগুলির ব্লকের জন্যও আমরা ইঁহাদিগের নিকট ঋণী।

যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিপি প্রমাদ ঘটিয়াছে। সেগুলি পাঠকগণ সহজেই সংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন, এই বিবেচনায় কোন শুদ্ধি পত্র সন্নিবিষ্ট হইল না। কেবল দুইটী ভুল এস্থানে সংশোধন করা উচিত। ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে অধ্যাপক কাউয়েলের ভারত পরিত্যাগ কালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিকট "দুঃখ প্রকাশ করিয়া" বলেন যে শিক্ষাবিভাগে তিনি দুইশত টাকা মাত্র বেতন পাইতেছেন কিন্তু

হেমচন্দ্র মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন।" "দুঃখ প্রকাশ করিয়া" কথাগুলি অনবধানতাবশতঃ লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্যামাচরণ বাবুকে জানেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে অর্থের প্রতি লোভ তাঁহার কোন কালেই ছিল না। ২৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধাদির জন্য তিনি অর্থসাহায্যপ্রার্থী হন, এবং হেমচন্দ্র তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। এ সংবাদ প্রকৃত নহে। সংস্কৃত কলেজের কোনও ছাত্রের পিতৃবিয়োগ ঘটিলে, হেমচন্দ্র এইরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। ইতি

৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩২৬ } শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

---*---

চিত্র-সূচী

হেমচন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ। সংসাররূপ বিষবৃক্ষে উৎপন্ন যে দুইটি অমৃতফলের বিষয় বুধগণ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কাব্যামৃতরসাস্বাদ একতর। যে সকল প্রতিভাশালী কবির রচনাপাঠে মনে হয় যথার্থই "কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর"—যাঁহাদের কাব্যসুধা যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবের তৃষিত প্রাণ শীতল করে, প্রকৃতির প্রিয় লীলাভূমি আমাদের এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমি সেইরূপ বহু কবিসন্তানের জননী।—

"কবিরঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল ঊষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন ললাট ভাসায়ে বয় ?

এই দেশেই, দ্বাদশ শতাব্দীতে, কেন্দুবিল্বগ্রাম পবিত্র করিয়া মহাকবি জয়দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দেশেরই—

"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে"

গীতগোবিন্দের মহাকবির "মধুরকোমলকান্ত পদাবলী" গীত হইয়া বঙ্গবাসীর হৃদয় অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসে আপ্লুত করিয়াছিল।

এই দেশেই, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, বিদ্যাপতির কণ্ঠ হইতে "কোকিল-বাণী" নিঃসৃত হইয়া বাঙ্গালার কাব্য-কুঞ্জে চিরবসন্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্যাপতি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে প্রেমের যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, তিনি

তাঁহার অমৃতকণ্ঠে যে মধুর বোল শুনাইয়াছিলেন, গৌড়-বাসী আজিও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই রূপ দর্শন করিতেছে—সেই মধুর বোল শ্রবণ করিতেছে—

"জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণহি শুনলু, শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥"

এই দেশেই, বিদ্যাপতির সমকালে, নান্নুরের চণ্ডী-দাস তাঁহার মধুর পদাবলীতে বাঙ্গালীকে যে গান শুনাইয়াছিলেন তাহা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল"—"আকুল করিল" তার প্রাণ। সে আকুলতা আজিও বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই দেশেই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ফুলিয়ার কৃত্তিবাস "কীর্ত্তির বসতি"—"যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী"—"কবি পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি" সুমধুর তানে রামায়ণ গান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাহার পর, এই দেশেই, কবি কাশীরাম বাঙ্গালীকে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" শুনাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। সে অমৃত আজিও বঙ্গের গৃহে গৃহে সযত্নে বিতরিত হইতেছে। সে অমৃত পান করিয়া হিন্দু মৃত্যুর ভয় ভুলিয়াছে!

তাহার পর, ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়" —যখন সমগ্র দেশে এক নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবকবির আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাহার পর আর একজন যথার্থ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—

"কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ!
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে, যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমর-কারিণী
বাগ্দেবী। ভোগিলা দুঃখ জীবনে, ব্রাহ্মণ!
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?"

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি। তাঁহার কাব্য, প্রতিভার প্রেরণায় রচিত—কোথাও কষ্টকল্পনা বা কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার কাব্য-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেই মতে—
উরিয়া মায়ের বেশ, কবির শিয়র দেশ
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে:
* * * *

চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত,
করে লয়ে পত্র মসী আপনি কলমে বসি,
নানাছন্দে লিখিলা কবিত্ব।"

•

মা'র প্রত্যাদেশে লিখিত মুকুন্দরামের এই অযত্ন-সম্ভূত অথচ অকৃত্রিম চণ্ডীর গান, গৌড়বাসী, মা'র নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল।

তাহার পর ঘনরাম, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু কবির প্রতিভালোকে বঙ্গদেশ উজ্জ্বল হইয়াছিল।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মা'র প্রিয়পুত্র কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে কালীকীর্ত্তন গান করিয়াছিলেন তাহার মধুর স্বরলহরী বাঙ্গালার হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়-বীণা অননুভূতপূর্ব্বভাবে ঝঙ্কৃত করিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানের তুলনা বঙ্গসাহিত্যে আর নাই—জগতের আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

হেমচন্দ্র

রামপ্রসাদের সমকালেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল।

"ভারতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষা গীত সুললিত অতুলিত সার॥"

ভারতচন্দ্রের কাব্য স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষদুষ্ট, কিন্তু অতুলনীয় পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দসম্পদের জন্য তাঁহার কাব্য চির-আদরণীয়। তাঁহার অবদান, চিরদিন

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥"

ভারতচন্দ্রের পর, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রামবসু, দাশুরায়, মধুকান প্রভৃতি বহু কবির উদ্ভব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত তুলনায় উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য নহেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পর যথার্থ কবি বহুদিন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন নাই। এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া কবি হেমচন্দ্র পরে লিখিয়াছিলেন—

"আর কি আছে সে সুরভিঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল গান?

আর কি এখন সুগন্ধময়,
গউড় নিকুঞ্জে মলয় বয় ?
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন কবি কিছু সম্মান ও আদর লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে বাঙ্গালীর উপর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব নিতান্ত সামান্য ছিল না।

"হাস্যরস কবিতায় তোমার সোসর
নাহি দেখি আর কারে।"

ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গ রসিকতায় অদ্বিতীয়,—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "তিনি আপন অধিকারের ভিতর রাজা।" কিন্তু তাঁহার শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছেন :—

মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত

ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণার ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় ভারতচন্দ্রের মাধুর্য্য ও পদ-লালিত্য ছিল না, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের দোষগুলি বিদ্যমান ছিল—গুপ্ত কবির কাব্যও অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য রচিত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য রচিত পুস্তকেও অশ্লীল উপাখ্যানাদি সন্নিবিষ্ট করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বীররস প্রভৃতির বর্ণনায়ও গুপ্তকবি সাফল্যলাভ করেন নাই।

"বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহুবলে দেবকুলরাজে"

সেই বীরশ্রেষ্ঠ সুন্দউপসুন্দের যুদ্ধ ও গৃহ-বিচ্ছেদের বৃত্তান্ত "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে"র রচয়িতার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ঈশ্বরচন্দ্র যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে—

সুন্দ উপসুন্দ।

সুন্দ উপসুন্দের প্রতি—

আর কেন মত্ত হোলে রূপবতী হেরে।
মর মর হতভাগা কেরে তুই কেরে॥
সমরেতে এখনিই যাবি শেষে হেরে।
দেব দেব দেব তোরে একেবারে সেরে॥
মরণ নিকট তোর রহিয়াছে সে রে।
পড়িবে কালের হাতে পালাতে না পেরে।
পায়ে ধোরে এই নারী আমারেই দেরে।
বিষয় বিভব যত তুই গিয়ে নেরে॥
ফের যদি কথা কোস আঁখি ঠেরে ঠেরে।
পাঠাইব যমালয় এক চড় মেরে॥
কোন মুখে কুলাঙ্গার নিতে চাস্ এরে।
মর মর হতভাগা কেরে তুই কেরে॥

উপসুন্দ। মুকুরেতে মুখ দেখ কালামুখো কালা।
বচনে করিস্ কেন মিছে ঝালা পালা॥
আমারে দিলেন শিব নারী কণ্ঠমালা।
তুই তারি পতি হবি এতো ঘোর জ্বালা॥
ভাল চাস প্রাণ নিয়ে পালা পালা পালা।
নহে তোর দেহ চিরে করি ফালা ফালা।

তুই নিবি প্রিয়তমা, এ রূপসী বালা।
নে তবে কেমনে নিবি আয় দেখি শালা॥***

ভারতচন্দ্রের কাব্যের পর এইরূপ কাব্য পাঠ করিতে কাহার ভাল লাগিবে? গুপ্তকবির রচনা সমসাময়িক সমাজে যতই আদর প্রাপ্ত হউক না কেন, উহার আদর যে দিন দিন হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এক সময়ে যে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন সে খ্যাতি লুপ্ত হইল, রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের যশঃপ্রভা কিরূপে খাঁটি বাঙ্গালার ও খাঁটী বাঙ্গালীর শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা-জ্যোতিঃ মলিন করিয়া দিল তাহা বুঝিতে হইলে, ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্তনে এই সময়ে দেশে যে মহান যুগপরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহার বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় নবযুগের প্রবর্তন। ইংরাজ অধিকারের সহিত বাঙ্গালায় কেবলমাত্র রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই আদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজ এদেশে

নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অন্য দেশ হইলে হয় ত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যে ইংরাজের আদর্শ অবিকল অনুকৃত হইত। কিন্তু যে দেশ এক-কালে ধর্ম্মজগতে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের স্মৃতিকারগণের সূক্ষ্মদর্শিতার ফলে শত সহস্র বিপ্লব ও অরাজকতার মধ্যেও হিন্দু সমাজ আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে দেশ বাল্মীকি বেদব্যাস হইতে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কত জগদ্বি-খ্যাত কবির কাব্যসুধা পানে বিভোর ছিল, সে দেশ ইংরাজের আদর্শ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করিল না।

"জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি"

সে জাতির মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ব্বগৌরবের মহিমো-জ্জ্বল স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল,সে জাতি বিদেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিল না। প্রতীচীর উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সে জাতি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইল, আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টিত হইল। সেই জন্য রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের

প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণের জন্য চেষ্টিত হইলেন। সেই জন্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হিন্দু বালবিধবা ও বহুদারপরায়ণ-কুলীন-পত্নীর দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হইয়া ইংরাজী আদর্শে সমাজ পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লইয়া স্মৃতিকারগণের সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহিত্যেও বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, প্রাচী ও প্রতীচীর জ্ঞানার্ণব মন্থন করিয়া. বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অমূল্য রত্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ আমাদের দেশের একটি মহান যুগপরিবর্ত্তনের কাল। দেশের ইতিহাসের জ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি এই বহুঘটনাময় সন্ধিকালের কোন একটি বিশেষ যুগকে বাঙ্গালীর মানসিক উদ্দীপ্তির যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। বাস্তবিক এই কয়েক বৎসরের ইতিহাস স্মরণ করিলে দত্ত মহাশয়ের উক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে, এই সময়েই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্র নির্ভীক ভাবে দেশবাসীর জন্য রাজনীতিক অধিকার-লাভের চেষ্টা পাইয়াছিল, এই সময়েই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গ-বিখ্যাত মনীষিগণের নেতৃত্বে দেশের রাজনীতিক উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, এই সময়েই মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করিয়া জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারের জন্য এই সময়েই বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার পত্যন্তর গ্রহণের এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র কুলীনদিগের বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন করিয়া-ছিলেন। এই সময়েই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্র দত্ত জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এই সময়েই কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই সময়েই স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়েই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা করিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেও এই সময়ে নূতন জীবনস্রোত

প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই রাজা রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' সমাপ্ত হয় এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকার্য্য আরব্ধ হয়। এই শতাব্দীতে এই দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। এই সময়েই কৃষ্ণমোহনের রোপিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টায় অনুবাদক সভা প্রতীচীর অমূল্য সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার প্রভৃতির সংস্কৃত-বহুল ভাষার প্রতিবাদ করিয়াই যেন এই সময়ে টেকচাঁদের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'মাসিকপত্র' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যুগেরই শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা ও টেকচাঁদের আলালী ভাষার সংমিশ্রণ করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনীর' অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করিলেন—সেই ভাষা ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত হইয়া যে ভাষার সৃষ্টি করিল, সেই সর্ব্বভাব-প্রকাশক্ষম ভাষা আজ বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিয়া গৃহীত। এই সময়েই মহারাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

মহোদয়গণের চেষ্টায় জাতীয় নাট্যকলার উন্নতি সাধিত হয় এবং পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও পরিহাসরসিক দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাদি রচিত হয়। সাময়িক সাহিত্যেও এই সময়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এই সময়েই প্রকাশিত হয়। টেকচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা', কালীপ্রসন্নের 'সর্ব্বশুভকরী' ও 'পরিদর্শক' এই সময়েই প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিলেন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। যখন হরিশ ও গিরিশের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বাঙ্গালীকে রাজনীতিক আন্দোলনের অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিল তখন "তুমি ঈশ্বরগুপ্ত আমিও ঈশ্বরগুপ্ত" প্রভৃতি প্রলাপসূচক বাক্যসম্বলিত সংবাদপত্র পাঠে লোকের আগ্রহ হ্রাস পাইল এবং হিন্দু পেট্রিয়টের আদর্শে অনুপ্রাণিত নবপ্রবর্ত্তিত "সোমপ্রকাশ" উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নির্ভীক ও ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী আজিও সাময়িকপত্রসম্পাদকগণের আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে।

এই সময়ে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের গতিও

পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার বিষয় পরে বিবৃত হইতেছে।

বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে নূতন যুগ। যুগ-প্রবর্ত্তক রঙ্গলাল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অসামান্য প্রভাব ছিল। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের সর্ব্বত্রই সমসাময়িক সমাজে অসামান্য সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দেখা যায়, সুতরাং সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক পরিহাসরসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র যে তাৎকালীন সমাজে অসাধারণ প্রভাব সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবিগণের ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন না—কেবল ব্যঙ্গকবিতারচনাতেই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সুতরাং এই সময়ে কাব্যামোদিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্যরচনা করিতেন। এই সময়ে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে অনেকগুলি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সচরাচর অনুকরণে যেমন হইয়া থাকে, কোনটিতেই মূলের ন্যায় রচনা-

লালিত্য, ছন্দ-পারিপাট্য ও শব্দসম্পদ প্রভৃতি গুণ ছিল না, কিন্তু প্রায় সবগুলিতেই অশ্লীলতা দোষ বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুল্য হীরকভ্রমে পণ্ডিতগণ কাচের আদর করিতেন না। ভারতচন্দ্রের আদর পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু এই সময় বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য অশ্লীল আদিরস-পরিপূর্ণ গ্রন্থের আবর্জ্জনার ভারে দূষিত হইয়া উঠিল। তখন ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত দেশবাসীর রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সুতরাং একশ্রেণীর পাঠকগণের মনোরঞ্জক হইলেও গুপ্তকবি বা ভারতচন্দ্রের অনুকারকগণের কাব্য ইংরাজী-শিক্ষিত দেশবাসীকে প্রীতিদান করিতে অসমর্থ হইল। ফলে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনাদরের ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়া উঠিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মধুসূদন দত্ত ও রামবাগানের দত্ত পরিবারস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজী কাব্যরচনায় মনঃসংযোগ করিলেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর আদিরসই তখন বাঙ্গালা কাব্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিল। যে দুই একজন শিক্ষিত লোক মাতৃভাষায় কাব্যরচনা করিয়া যশোলাভের জন্য উৎসুক হইলেন, তাঁহারাও এই হীন আদর্শ গ্রহণ করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সময়ে কলেজে ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু যে সকল কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা স্থানে স্থানে এরূপ অশ্লীল আদিরস-পরিপূর্ণ যে তাহা পাঠ করিতে লজ্জা হয়। অথচ ইহাও সত্য যে একশ্রেণীর পাঠক এই সকল কবিতার প্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করিতেন। আমরা বঙ্কিম বা দীনবন্ধুর দোষ প্রদর্শন করিতেছি না, আমরা কেবল তাৎকালীন বাঙ্গালা কাব্যের আদর্শ ও তাৎকালীন কবিগণের প্রভাব প্রদর্শনের জন্য এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতেছি।

এই সময়ে একজন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া দুই একজন গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী ধনীর সহানুভূতি আকৃষ্ট করেন। তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আক্ষেপোক্তি করেন :—

আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম,
এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥

রঙ্গলাল "পদ্মিনী উপাখ্যানের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন

"কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ণে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিততৎপর সুনির্ম্মলচরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা-কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতাসত্ত্বে তত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে বিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্যরচনার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন।"

এই অনুরোধের ফলে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়।

রঙ্গলাল কোন শ্রেণীর কবি ছিলেন, তাঁহার কিরূপ প্রতিভা ছিল, আমরা এস্থলে তাহা বিচার করিব না। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি কার্য্যের জন্য তাঁহার নাম চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে সকল কাব্যপাঠে পাঠকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে, সেই সকল কাব্যের আবর্জ্জনার আতিশয্যে যখন বঙ্গসাহিত্য প্রপীড়িত, তখন রঙ্গলালই

বাঙ্গালীকে "ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত" করাইয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি কাব্যরচনা করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিলেন যে, 'যে সকল রস বিশ্বজনীন, যে সকল ভাব বিশ্ববাসী সকলেরই প্রাণে আঘাত করে, তাহা বিদেশীয় সাহিত্য হইতে স্বদেশীয় সাহিত্যে আনিলে জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, জাতীয় বিশেষত্ব নষ্ট হয় না।' তিনি ইহাও দেখাইলেন যে, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনই সাহিত্যক্ষেত্রেও পরিমার্জ্জিত-রুচি ইংরাজী-শিক্ষিত দেশবাসীকে জাতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিতে হইবে। রঙ্গলালকে এই জন্য আমরা নবযুগের অগ্রদূত বা বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের একজন প্রধান যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনিই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে আদিরস-পরিপ্লাবিত বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ভাষায় "অশ্লীলতার পঙ্কিল সলিলে যে সময়ে কবিত্বপদ্ম কলুষিত হইতেছিল, সেই সময়ে উন্নতহৃদয় রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ভাষার স্রোত ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া গিয়া-

ছেন, পরিমার্জ্জিত রুচি, বিশুদ্ধ ভাব ও রসমাধুর্য্যপূর্ণ কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।”

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ প্রকাশিত হইলে সকল শ্রেণীর পাঠকগণের নিকট উহা উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের শিষ্য হইলেও, পদ্মিনীর ন্যায় বহুরসপূর্ণ কাব্য বাঙ্গালী বহুদিন পাঠ করে নাই। আদিরসপ্লাবিত বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে যে এরূপ বীররসাত্মক পদ লিখিত হইতে পারে, তাহা বাঙ্গালী যেন নূতন করিয়া শিখিল—

“স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।”

বঙ্গের গৃহে গৃহে কাব্যরসামোদী পাঠকগণ এই সকল পদ কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার কুল-

লক্ষ্মীগণের হৃদয় নিম্নোদ্ধৃত পদাদি পাঠকালে অননুভূত-পূর্ব্বভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"এসো এসো সহচরীগণ !—এস সহচরীগণ !
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥
পর সবে মনোহর বেশ,—বাঁধ বিনাইয়া কেশ,
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি ! আজিরে সুদিন,—ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন ;
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ।
আজি অতি সুখের দিবস,—পাব সুখ মোক্ষ যশ ;
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ॥
পরিণয়-প্রমোদ উৎসবে,— ভেবে দেখ দেখি সবে ;
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিত তবে ?
সবে তবে চললো বালিকা—যথা মুদিতা মালিকা ;
অলি যে আনন্দ দাতা জানে কি কলিকা ?
সকলেতে জেনেছ এখন,—পতি অতি প্রাণধন,
যার জন্য যুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,—এই ছার কলেবরে ;
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে ?"

'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের সহিত জাতীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রঙ্গলালের সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "কর্ম্মদেবী"র ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেনঃ—

"এইক্ষণে পরমাহ্লাদসহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্যকুসুম [পদ্মিনী উপাখ্যান] বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি পদ্মিনী প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয় মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাবিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে।"

উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষভাগে যে সকল শক্তিশালী কবির প্রতি ইঙ্গিত আছে; তন্মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্ব্বপ্রধান। মধুসূদন প্রথমে ইংরাজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহা Captive Ladieর সমালোচন প্রসঙ্গে

"বেঙ্গল হরকরা"-সম্পাদক কিছু অভদ্রভাবে এবং সহৃদয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কিছু ভদ্রভাবে মধুসূদনকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দূরদর্শী বেথুন মধুসূদনকে স্বদেশীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের পরেই মধুসূদন তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন বুঝি কবির হৃদয়ে অনুতাপ জাগিল—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে—
"ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে!"

মধুসূদন বঙ্গলক্ষ্মীর আদেশ শুনিলেন—

"পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে,
মাতৃ-ভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণি-জালে।"

অভিমানবশে ক্ষণকালের জন্য জননীকে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপানলদগ্ধ হৃদয়ে সন্তান যেভাবে স্নেহময় মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসে এবং জননীর প্রাণপণ সেবা করিয়া যেভাবে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, মধুসূদন সেই ভাবে বাঙ্গালার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প হইল :—

"রচিব মধুচক্র গৌড়-জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে তিলোত্তমা আদৃত হইল বটে, কিন্তু সাধারণ্যে উহা তেমন সমাদর প্রাপ্ত হইল না। বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের সমালোচন-প্রসঙ্গে যথার্থই লিখিয়াছেন, "ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ,

দুরান্বয়, 'ভূষেন,' 'অম্বিরি,' 'কাম্তিল' 'কেলিনু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়াপদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে তাহা ভেদ করিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।" বাস্তবিক যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মধুর ও প্রাঞ্জল অমৃতপদাবলীর রসাস্বাদনে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট মধুসূদনের শ্রুতিকটু শব্দের নিপুণ বিন্যাস আদৃত না হওয়ায় বিস্ময়ের কারণ নাই।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশিত হইল। "মেঘনাদবধ মাইকেল-সাগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। ইহাতে কবি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।" কিন্তু এইগ্রন্থও পণ্ডিতসমাজে তেমন সমাদৃত হয় নাই। তাহার কারণ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দ্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণ-দোষ যত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তত দেখা যায় না সত্য বটে, কিন্তু দানিনু, চেতনিলা, অম্বিরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তা

ছাড়া, 'দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত' 'মরি কিবা' 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলে হাস্যসম্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেক স্থলও আছে, যেখানে সেই সেই অলঙ্কারগুলি অতি কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২।৩টি কথাদ্বারা উৎকৃষ্ট কবি যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, তিনি বোধ হয় অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার রচনাও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদাপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগদ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় নাই।"

মধুসূদনের সতীর্থ ও পরমবন্ধু রাজনারায়ণ বসু, যিনি কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের সহিত মধুসূদনের তিলোত্তমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনিও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—



রাজনারায়ণ বসু

"জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয় অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টালুন দেখা যায়। আর্য্যকুল-সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু, ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবি-কঙ্কণ যেমন জাতীয়ভাবসম্পন্ন তেমন অন্য কোন কবি নহেন। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে মিণ্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিণ্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য ও রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে তত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিণ্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে' 'নাদিল দম্ভোলি কড়্‌কড়্‌ রবে' ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে

মাইকেল মধুসূদন 'খেদাইনু' 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি 'রামভদ্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিণী, শকুনি ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনাদ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল।"

হেমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দোষও যেমন অসাধারণ, গুণও তেমনই অসাধারণ। যখন একদিকে বঙ্গসাহিত্যের সুধী সমালোচকবৃন্দ মধুসূদনের কাব্যের তীব্র সমালোচনা ও দোষপ্রদর্শন করিতেছিলেন এবং একদল সাহিত্যিক 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া মধুসূদনের রচনার দোষগুলি বড় করিয়া দেখাইতেছিলেন; এবং অপর দিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ নব্যযুগের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রশংসা করিতেছিলেন এবং প্রকাশ্যসভায় অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সমাদর করিতেছিলেন, সেই সময়ে নূতন যুগের আর একজন তরুণ কবির আবির্ভাব

হইল। তিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বাল্যাবধি ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত ছিলেন না বলিয়া "নিতান্ত-সঙ্কুচিতচিত্তে" কাব্যযশঃপ্রার্থী হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশঃপ্রভা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিদেশীয় আদর্শ ও বিকৃত রুচির জন্য মধুসূদন যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন। হেমচন্দ্রও মধুসূদনের ন্যায় বিদেশীয় কবিগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে ঋণী, কিন্তু তাঁহার কাব্য দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার এতদূর প্রিয় হইয়াছিল যে, যখন মাইকেল যশঃশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় ছিলেন এবং যখন হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বৃত্র-সংহারের রচনা আরব্ধ হয় নাই, তখনই হেমচন্দ্র মধু-সূদনের সমকক্ষ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য যখন উদারহৃদয় হেমচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী কবি মধুসূদনের বিয়োগবেদনায় ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন—

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ বঙ্গের উজ্জ্বল রবি।
তোমারি অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি॥"—

তখন সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার "মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই"—তিনি বলিয়াছিলেন, "হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনও রোদন করিব না।"

বৃত্রসংহার মহাকাব্য রচনার পূর্ব্বে এবং অনতিকাল-মধ্যে, কি গুণে হেমচন্দ্র মহাকবির সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার কারণ আমরা পরে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাইব। এই স্থলে এই কথা স্মর্ত্তব্য যে, হেমচন্দ্র বিদেশীয় সাহিত্যের নিকট ঋণী হইলেও, তিনি কখনও জাতীয়তা হারান নাই। তিনি কখনও বিদেশীয় আদর্শকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিদেশীয় কবিগণের ভাব সঙ্কলন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, স্বদেশীয় কবিগণের পদাঙ্কও অনুসরণ করিতে বিরত হন নাই। তাঁহার কাব্যে একদিকে যেরূপ সেক্ষপীয়র, মিল্টন, দান্তে, ড্রাইডেন, টেনিসন, লংফেলো, বায়রণ ও শেলীর প্রভাব দেখা যায়, অপর দিকে তাঁহার কাব্যে স্বদেশীয় কবিগণের প্রভাবও লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যে কোথাও বৈষ্ণব কবিগণের মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণ,

কোথাও কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের সরলতা ও প্রাঞ্জলতা, কোথাও 'কঙ্কণ কবি'র চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা, কোথাও ভারতচন্দ্রের সুমধুর পদলালিত্য, কোথাও ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গ রসিকতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। আর কোন কবির কাব্যে বাঙ্গালী একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ দেখে নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের যাহা নিজস্ব তাহার উপরই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। তাহা তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম ও অপূর্ব্ব স্বজাতি-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত। যখন স্বদেশপ্রেমিক রাম-গোপালের বাগ্মিতা এবং হরিশ, গিরিশ ও কৃষ্ণদাসের লেখনী বাঙ্গালীর রাজনীতিক অধিকারবিস্তৃতির জন্য প্রয়াস পাইতেছিল, যখন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণ-মোহন দেশের অতীত গৌরব-কাহিনী উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছিলেন, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রাম-মোহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতঃ হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচারে উদ্যত হইয়াছিলেন, যখন বিদ্যাসাগর ও ভূদেব শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া দূরদর্শী প্রাচীন স্মৃতিকারগণের সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণের জন্য প্রযত্ন করিতেছিলেন, যখন কালীপ্রসন্ন সারস্বতাশ্রমে 'পুরাণ-সংগ্রহ' করিয়া প্রচার করিতেছিলেন, বাঙ্গালার

সেই সন্ধিযুগে দেশবাসী 'ভারত-সঙ্গীতে'র স্বদেশপ্রেমিক কবির প্রতীক্ষা করিতেছিল। যে কবির তূর্য্যনিনাদে মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, যে কবির বীণার স্বর-তরঙ্গ জাতীয় সুখে উচ্ছ্বসিত, জাতীয় দুঃখে বিমূর্চ্ছিত, জাতীয় গর্ব্বে উদ্বেলিত, জাতীয় দৈন্যে সংক্ষোভিত হইয়া পড়ে, দেশবাসী সেই 'জাতীয় কবি'র প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই জন্য 'ভারত সঙ্গীতে'র কবি, মধুসূদনের প্রতিষ্ঠাকালেই, অপূর্ব্ব সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় —হেমচন্দ্রের এই সর্ব্বজনপ্রিয়তার কারণ—"বাঙ্গালী যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।"

মধুসূদনের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে মহাকবি-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া তাঁহার কবি-সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ—বাঙ্গালীর চির-গৌরবের বস্তু। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ও চিন্তাশীল সন্দর্ভ-লেখক, পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার

—মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত।”

মধুসূদন যথার্থ কবির স্বরূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

“সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
নন্দন-কানন হ'তে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।”

এই উচ্চ আদর্শ লইয়া বিচার করিলে কয়জন কবি মহাকবি হেমচন্দ্রের সহিত তুলিত হইতে পারেন? যাঁহার মহাকাব্যে কোথাও গগনমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া শিবের ক্রোধাগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও কোমল-হৃদয়া দৈত্যবধূর করুণায় পাষাণও বিগলিত হইয়া গিয়াছে, কোথাও দৈত্যেন্দ্রের দম্ভভরে মেদিনী কম্প-

মানা হইয়াছে, কোথাও স্বরীশ্বরীর গৌরব-বিভায় নন্দনকানন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও সুরেন্দ্রের তপঃপ্রভাবে নিয়তি বাধ্য হইয়াছে, কোথাও স্বজাতিপ্রেমিক দধীচির দেহত্যাগে পরহিত-ব্রতের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন্ কবি তাঁহার সহিত উপমিত হইতে পারেন ? যে হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব শৃঙ্গনাদে অচেতন প্রাণে চেতনা আসিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের শুভশঙ্খরবে পতিতপাবনী গঙ্গা অপূর্ব্ব রঙ্গে কলকলস্বরে চলিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের প্রাণোন্মত্তকারী ভেরী-নিনাদে পূর্ব্বগরিমাস্মৃতি-গর্ব্বিত জাতির ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের মৃদুবংশীরবে প্রেমযমুনায় উজান বহিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের কাঁসরঘণ্টাধ্বনিতে বিশ্বেশ্বরের আরতি-সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি সুপ্রকাশিত হইয়াছে, যে হেমচন্দ্রের বিষাণে মহাসতী-বিয়োগবিধুর মহেশ্বরের অব্যক্ত বেদনা অভিব্যক্ত হইয়া ত্রিভুবনকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের সেতারের মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গের কামিনীকুসুমের সরম-জড়িত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দনধ্বনি শ্রুত হইয়াছে, সে হেমচন্দ্রের তুলনা কোথায় ?

ধন্য সেই মহাকবি, যাঁহার কাব্য এমন করিয়া

হেমচন্দ্র

"বীর রৌদ্র হাস্য,   করুণার দৃশ্য
নয়নে তুলিয়া ধরে।"

যাঁহার কাব্যে

"সব রস যেন,   মূর্ত্তিমান হেন
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়।"

ধন্য সেই দেশ, যে দেশে এরূপ মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন! আর, ধন্য সেই জাতি, যে জাতির সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা, গর্ব্ব, দৈন্য, প্রেম, ঘৃণা, আকাঙ্ক্ষা ও অভাব লইয়া এইরূপ 'জাতীয় কবি' জাতীয় কাব্য রচনা করেন!

কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যে এরূপ কবি অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। এরূপ ক্ষণজন্মা কবির জীবনী ও কবিত্বের আলোচনায় কাহার না আনন্দ হয়?

আমরা এই আনন্দলাভের আশায় আজি এই মহাকবির জীবনী ও কবিত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত ইতিহাসবর্ণন, তাঁহার কাব্যের যথাযথ সমালোচন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের উপকরণগুলি একে একে বিনষ্ট হইতেছে। আমরা শ্রদ্ধার স্তিমিত প্রদীপ মাত্র সম্বল করিয়া অতীতের অন্ধকারময়

কক্ষে প্রবেশ করিয়া, কালের আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহার জীবনীর উপাদানগুলি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইব। কি প্রয়োজনীয়, কি অপ্রয়োজনীয়, তাহা বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই। শ্রদ্ধার আলোকে যাহা উজ্জ্বল বলিয়া প্রতিভাত হইবে তাহাই আনিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। যদি এই আলোচনায় একটিও নূতন সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। যদি এই আলোচনা কেবলমাত্র পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা হইলেও, আশা করি, পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; কারণ, বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় কবি হেমচন্দ্রের কথা শতবার আবৃত্তি করিলেও যে বাঙ্গালীর নিকট তাহা অপ্রিয় হইবে না—এ আশা অসঙ্গত নহে। আর যে মহাকবির জীবন যথাযথভাবে চিত্রিত করা আমাদের ক্ষমতাবহির্ভূত, তাঁহার স্বর্গগত অমর আত্মার নিকট, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়, তাঁহারই ভাষায় প্রার্থনা করি,—

"বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব-অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার॥"

—*—



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বারাণসীতে গৃহীত ফটো হইতে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০*০—

বাল্য-জীবন।

জন্ম। সন ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, কবিবর হেমচন্দ্র হুগলী জিলার অন্তর্গত গুলিটা রাজবল্লভহাটে মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশবিবরণ। হেমচন্দ্র সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। উত্তরপাড়ায় একটি সামান্য পৈত্রিক আবাসভবনের অংশ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু যে বংশে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। হেমচন্দ্র, রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর 'সন্তান'। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন এবং রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর 'সন্তান' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতা হইতে হেমচন্দ্রের আভিজাত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে।

হেমচন্দ্র

ব্রহ্মা
|
অত্রি
|
সাণ্ডিল্য
|
কলিব্যাস
|
বেদব্যাস
|
ক্ষিতীশ
|
ভট্টনারায়ণ
|
বরাহ
|
বৈনতেয়
|
বিবুধেয়
|
সুবুদ্ধি
|
গয়া
|
জহ্নু
|
শকুনী
|
মহেশ্বর
|
মহাদেব

হেমচন্দ্র

মহাদেব
|
বৈনিতা
|
হরি
|
উদয়
|
মাধব
|
বিষ্ণু
|
পৃথ্বীধর
|
গঙ্গাধর
|
ভগীরথ (ফুলে মেল)
|
শ্রীপতি
|
জগন্নাথ
|
রাঘব
|
জয়রাম
|
রুদ্ররাম
|
অভিরাম
|
রামরাম

- রামরাম
  - রত্নেশ্বর
    - গোলক
      - কীর্ত্তিচন্দ্র
      - শিবচন্দ্র
      - কৈলাসচন্দ্র
        - হেমচন্দ্র
        - পূর্ণচন্দ্র
        - যোগেন্দ্রচন্দ্র
        - ঈশানচন্দ্র

হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল, তাহা নহে। তথাপি হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী ব্যতীত রাজচন্দ্রের আর কোন সন্তান না থাকায়, হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্রকে তিনি নিজের গৃহে রাখিয়া ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পিতারও অন্য কোন অবলম্বন না থাকায় তিনি রাজচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভহাটে (রাজবোল্‌হাটে) রাজচন্দ্রের কিছু জমি ছিল, কয়েক ঘর যজমান ছিল এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুর নামক স্থানে তাঁহার একটি সামান্য আবাসভবন ছিল। রাজচন্দ্র খিদিরপুরে



হেমচন্দ্রের জননী—আনন্দময়ী

থাকিয়া মোক্তারী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে এই ক্ষুদ্রপরিবারের কোনমতে ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইত।

এক্ষণে খিদিরপুরে পদ্মপুকুরের দক্ষিণপার্শ্বে যে স্থানে হেমচন্দ্রের আবাসভবন অবস্থিত, উহার পূর্ব্বাংশে তাঁহার মাতামহের ক্ষুদ্র একতল বাটীতে হেমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

হেমচন্দ্রের মাতামহ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন না হইলেও, হেমচন্দ্রের একটি কবিতা পাঠে প্রতীত হয় যে, তিনি প্রতিবৎসর তাঁহার বাটীতে ৺দুর্গাপূজা করিতেন।

হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র সত্যবাদী ও স্বাধীন প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর, পরিবারের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইলে, কিছুদিন তিনি ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবসায় করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের একজন সহপাঠী বলেন যে, হেমচন্দ্র এই সময়ে প্রায়ই তাঁহার পিতার রক্ষিত একখানি গাড়ীতে খিদিরপুর হইতে হিন্দু স্কুলে আসিতেন।

হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী অতি সরলা, ধর্ম্ম-



হেমচন্দ্রের ভ্রাতা—পূর্ণচন্দ্র

শীলা, পতিপরায়ণা ও পরদুঃখ-কাতরা রমণী ছিলেন। ধনীর গৃহ না হইলেও, আনন্দময়ীর সুব্যবস্থায় কোন ভিক্ষুক বা অতিথিকে বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইত না। হেমচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহিত আনন্দময়ীর দানের পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র তাঁহার জননীর কোমল হৃদয়, ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কৈলাসচন্দ্রের ঔরসে আনন্দময়ীর গর্ভে চারিপুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। চারিপুত্র—হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের মধ্যে হেমচন্দ্রই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র উত্তরকালে ৺বারাণসীধামে বাস করিতেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অল্পবয়সেই গতাসু হন। কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র প্রথমে হুগলী কালেক্টরীতে কার্য্য করিতেন এবং পরে হাইকোর্টে একটি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহাঁর "বাসন্তী" ও "চিত্তমুকুরে" অনেকগুলি সুললিত কবিতা আছে। কিন্তু ইহাঁর রচিত "যোগেশ কাব্য"ই বোধ হয় ইহাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং বঙ্গ-



হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ঈশানচন্দ্র

সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিবে। হেমচন্দ্র অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন।

হেমচন্দ্রের দুই সহোদরা বসন্তকালী ও নৃত্যকালীর মধ্যে কনিষ্ঠা নৃত্যকালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি অল্পবয়সে বিধবা হন এবং দুইটী মাত্র কন্যা লইয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করেন। ইনিই হেমচন্দ্রের গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। অনেকেই জানেন যে, হেমচন্দ্রের দাম্পত্য-জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী চিরদিনই স্বল্পবুদ্ধি ছিলেন এবং পরে উন্মাদরোগে আক্রান্তা হন। নৃত্যকালীই সংসারে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিয়া সুগৃহিণীর সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। হেমচন্দ্র যে আদর্শ বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

"হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এ দেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে' তারে নয়নে হেরিত।



নৃত্যকালী ও বসন্তকালী

(হেমচন্দ্রের ভগিনীদ্বয়)

লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে!"--

সে রমণী যে তাঁহারই সহোদরা নৃত্যকালী এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

বাল্যজীবনের স্মৃতি। হেমচন্দ্রের শৈশব গুলিটাগ্রামে মাতামহালয়েই অতিবাহিত হয়। নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি খিদিরপুরে আনীত হন। শৈশবের দিনগুলি কি মধুর! বার্দ্ধক্যে অন্ধাবস্থায় ভগ্নহৃদয় কবি হেমচন্দ্র শৈশবের সেই সুখময় স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া তাঁহার অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবনের স্মৃতি তিনি তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'চিত্ত-বিকাশে'—'কি সুখের দিন' শীর্ষক কবিতায়—স্বয়ং এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"শৈশব সময় বর্ষ বার তের
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,
জানিনা কখন দুঃখ যে কেমন।

তখন (ও) পূজাই মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখেপূর্ণ ধরা, শূন্য সুখে ভরা,
সুখেরই প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতামহ'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,
কখন(ও) অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পুরাতেন তিনি করিয়া আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,

কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে,
নববস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে।

সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশী শোভা,—প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।

আসে যায় হেন কতই দর্শক,
গ্রাম পল্লীবাসী কতই আসে,
ভিক্ষুক যাচক গীতবাদ্যকর,
অতিথ্ অভ্যাগত কত কি আশে।

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন,
কলরবপূর্ণ সদা আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্টমতি কুটম্ব জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার(ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।

সেকালের প্রথা রামায়ণ গান,
অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র-লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয় ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,

আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।

জননীর স্তন ক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার
যে জেনেছে বাল্য-ক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর ?"

বিদ্যারম্ভ। রাজবল্লভহাটের গ্রাম্য পাঠশালায় হেমচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। হেমচন্দ্রের তৃতীয় (এবং এক্ষণে একমাত্র জীবিত) পুত্র শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি তাঁহার পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি এবং পাঠে মনোযোগী ছিলেন। প্রাতে বস্ত্রপ্রান্তে এক অঞ্জলি মুড়কী লইয়া বালক হেমচন্দ্র কিরূপে পদব্রজে প্রতিদিন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় যাইতেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সময়ে সময়ে ভাঙ্গা জালার পিঠে খড়ি দিয়া অঙ্ক কষিতেন হেমচন্দ্রের জননী তাঁহার পৌত্রগণের নিকট সগৌরবে তাহার বর্ণনা করিতেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে নয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে হেমচন্দ্র খিদির-

পুরে আনীত হন এবং স্থানীয় পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

বাল্যবন্ধু। এই স্থানে হেমচন্দ্রের দুইজন অকৃত্রিম বাল্যবন্ধুর বিষয় কিছু না বলিলে তাঁহার বাল্য-জীবনের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ হইবে। হেমচন্দ্রের গৃহের অনতিদুরে, খিদিরপুর পদ্মপুকুরের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রসিদ্ধ জমিদার ৺মোহনচাঁদ ঘোষের প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিরাজিত আছে। মোহনচাঁদ ঘোষ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের বলে সামান্য অবস্থা হইতে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সেরেস্তাদারের পদ অধিকার এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ভ্রাতা তারাচাঁদও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতা মোহনচাঁদের পুত্রগণকে দান করিয়া যান। মোহন-চাঁদের দুই পুত্র ছিলেন—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র, হেমচন্দ্র অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র, হেমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। হেমচন্দ্রের মাতামহের মৃত্যুর পর হেমচন্দ্রের পিতার অবস্থা অসচ্ছল

হয়। এই সময় মোহনচাঁদ ঘোষ তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই সূত্রে দরিদ্রসন্তান হেমচন্দ্রের সহিত ধনীসন্তান শ্রীশচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রথম আলাপ হয়। পরে মোহনচাঁদের ভগিনী হেমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রকে "ভিক্ষাপুত্র" গ্রহণ করেন এবং বালকগণের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। বালকগণের স্বভাব এরূপ মধুর ও কমনীয় ছিল যে, অবস্থার এতদূর পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীশচন্দ্র হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার বি-এ উপাধি লাভ করেন। কিন্তু কোন বিষয় লইয়া পিতার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই আত্মহত্যা করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর বিষয় পরে পুনরায় উল্লেখিত হইবে। যোগেন্দ্রচন্দ্র ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ২০শে পৌষ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ২২শে ফাল্গুন দিবসে পরলোকগমন করেন। অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও গভীর বিদ্যানুরাগের জন্য তিনি বাঙ্গালীর বরণীয় ছিলেন এবং বহুদিন স্মরণীয় থাকিবেন। তিনি প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার এতা-



যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

দৃশ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল যে স্তর হেনরি কটন, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী ডাক্তার কন্‌গ্রীভ্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন। 'কলিকাতা রিভিউ' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ডাক্তার্‌ কন্‌গ্রীভ বিখ্যাত দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে দেখাইলে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। স্যর হেনরি তাঁহার 'Indian and Home Memories' নামক গ্রন্থের একস্থানে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন:— "And I would not like to omit mention of my dear friend Jogendra Chandra Ghose of Kidderpore, a profound student and philosopher, who took little or no part in public life but deeply impressed by his example and teaching the many friends who cherish his memory and mourn his loss." ইহাঁর মৃত্যুর পর লণ্ডনের (হবর্ণ) "মানব মন্দিরে" (Church of Humanity, London) স্তর হেনরি

কটন যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মনীষীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ। পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী শিক্ষা করিয়া যখন হেমচন্দ্র কৈশোরে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্র ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোন কায করিতেন না এবং শ্বশুরের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ছিলেন। এক্ষণে পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইল। এই সময়ে পরোপকারী পণ্ডিতপ্রবর প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পাঠ্যাবস্থায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দুকলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পুণ্যস্মৃতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং শিক্ষাবিভাগের সকল অধ্যাপক প্রসন্নকুমারকে স্নেহ করিতেন। প্রসন্নকুমার পূর্ব্বে খিদিরপুরে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী একদিন প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং 'সাহেবদিগকে বলিয়া' হেমচন্দ্রের জন্য একটি ১৫।২০

টাকার চাকুরীর চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নকুমার বালক হেমচন্দ্রের সুগঠিত দেহ ও আয়ত-লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে পরামর্শ দিলেন। হেমচন্দ্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্গতি নাই শুনিয়া প্রসন্নকুমার স্বয়ং হেমচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকুমারের নিকট হেমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্র অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে মনীষী প্রসন্নকুমারের নিকট নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন-কুমার এই দরিদ্র বালকের কমনীয় স্বভাবে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অনুজ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হেমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখিয়া প্রসন্নকুমারও মুগ্ধ হইলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে হেমচন্দ্র পাঠে এত উন্নতি দেখাইলেন যে প্রসন্ন-কুমার তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য হিন্দুকলেজ সংশ্লিষ্ট স্কুলে সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বোধ হয় প্রথমে প্রসন্নকুমারই হেমচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। হেমচন্দ্রের সতীর্থ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়



প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

বলেন যে পরে বোধ হয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ হেমচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ ও দারিদ্র্যের কথা অবগত হইয়া দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং তাঁহার স্কুলের বেতন দিতেন।

হেমচন্দ্র বাল্যকালে প্রসন্নকুমারের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। "প্রসন্ন-দাদা"র নিকট তাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণের কথা তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেন এবং প্রসন্ন-কুমারের অনুজগণকে কেবল ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন এমন নহে, তাঁহাদিগের প্রতি সহোদরবৎ বাৎসল্য-ভাব প্রদর্শন করিতেন।

হিন্দুকলেজে হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিষয় পর-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষালাভ।

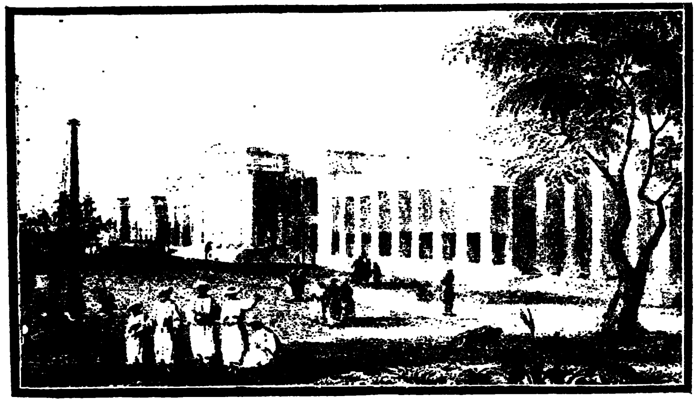
হিন্দু কলেজে প্রবেশ।—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজে 'সিনিয়র' স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কলেজের তদানীন্তনকালের কার্য্যবিবরণী হইতে কলেজের শিক্ষকগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কলেজ বিভাগ

প্রিন্সিপ্যাল	জে, সাট্‌ক্লিফ্‌	বেতন	৬০০৲
ইংরাজী সাহিত্যের সহঃ অধ্যাপক,	আর্ হ্যাণ্ড্‌	"	৩০০৲
'সার্ভেয়িং'-শিক্ষক	জে, রো	"	১০৬৷৶১০
ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক	ডব্লিউ, থিওবোল্ড্‌	"	৩০০৲
সাহিত্যের অধ্যাপক	ডব্লিউ, গ্রেপেল	"	২৫০৲

'সিনিয়র' স্কুল বিভাগ

প্রধান শিক্ষক	আর্, জোন্স্‌	বেতন	৫০০৲
দ্বিতীয় শিক্ষক	সি, টি, ডন্	"	২০০৲
ইংরাজীর শিক্ষক	জে, বি, গ্রিসেনথোয়েট্‌	"	২০০৲
বাঙ্গালাসাহিত্যের শিক্ষক	রামচন্দ্র মিত্র	"	২০০৲



হিন্দু-কলেজ
(১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত চিত্র হইতে)

প্রথম পণ্ডিত	পীতাম্বর শর্ম্মা	"	৩৫৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত	গৌরীচরণ শর্ম্মা	"	২০৲

হেমচন্দ্র বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বভাবগুণে সহপাঠিগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পাঠে মনোযোগিতার জন্য শিক্ষকগণের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। সকল বিষয়েই হেমচন্দ্র পারদর্শিতা দেখাইতেন। সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় হেমচন্দ্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। হিন্দুকলেজের কার্য্যবিবরণীতে লিখিত আছে :—

The Examiners * consider the following boys deserving of certificates of honor :—

Second class.

1. Gopal Chandra Banerjea—Mathematics.
2. Hem Chandra Banerjea—Literature.
3. Rooplal Mitter†—Vernacular.

* মিঃ সাটক্লিফ (গণিত), মিঃ জোন্স (ইংরাজী ব্যাকরণ), মিঃ হ্যাণ্ড (ইংরাজী সাহিত্য), মিঃ গ্রিসেন্থোয়েট (ইতিহাস) মিঃ ভন্ (জ্যামিতি), মিঃ রজার্স (ভূগোল) ও রামচন্দ্র মিত্র (বাঙ্গলা সাহিত্য) পরীক্ষক ছিলেন।

† রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র।

সতীর্থ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।—স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ কালে হেমচন্দ্র যে কয়েকজন সহপাঠীকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ইঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই এখনও জীবিত আছেন এবং ইঁহাদের স্মৃতি-কথা হইতে আমরা হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিবরণ সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল, হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ও হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ইনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সৈন্যসংক্রান্ত হিসাববিভাগে প্রবেশ করেন এবং সুদীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় পরোপকারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, মধুরভাষী ও অমায়িকস্বভাব ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানে ইঁহার সহানুভূতি আছে।



শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার

ইনি এককালে হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়টে,' কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' ও গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তে প্রস্তাবাদি লিখিতেন এবং কিছুদিন Oudh Gazette সম্পাদন করিয়াছিলেন। দেশে বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের বিস্তারের জন্য ইঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে। ইনি বহুকাল হইতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভায় অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত আছেন এবং সরকার মহাশয় কর্তৃক প্রবর্তিত Journal of Medicine নামক পত্রের সহিত বহুদিন একজন নিয়মিত লেখকরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন। এক্ষণে ইনি অন্ধ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন দিবসে হুগলী জিলার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বেগের গাঙ্গুলী, হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান। শৈশবে রুগ্ন থাকায় পাঠশালায় অতি অল্প শিক্ষা হয়। গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একজন শিক্ষক যে সামান্য স্কুল চালাইতেন, তাহাতে ও অন্য কয়েক স্কুলে শ্যামাচরণ বাবু পরে সামান্য ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তরপাড়া গবর্ণ-



শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

মেণ্ট স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং এই সময় হইতে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। উত্তরপাড়া স্কুলের তাৎকালীন প্রধান শিক্ষক প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশে তিনি বিশেষ উপকৃত হন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। শ্যামাচরণ বাবু হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের এক উজ্জ্বল রত্ন। কলেজের সমস্ত পরীক্ষায়, জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় শ্যামাচরণ বাবু প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে ইনি কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং সতীর্থ নীলমণিবাবু ও হেমচন্দ্রের ন্যায় সৈন্য-সংক্রান্ত হিসাব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এ উপাধি পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ উপাধিলাভের পর ইনি প্রথমে জনাই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধানগরস্থিত ইঙ্গ-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি মাগদহ স্কুলের প্রধান

শিক্ষক নিযুক্ত হন। মালদহের পর ক্রমান্বয়ে আরা জিলা স্কুলের ও ছাপরা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নয় বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐ স্কুল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলেজে পরিণত হইলে শ্যামাচরণবাবু উহার অধ্যক্ষ এবং পরিচালন-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩৪ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যাঁহাদের অধীনে শ্যামাচরণবাবু শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারা সকলে একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর স্যর আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি তারিখের একখানি পত্রে ইঁহার "Long and valuable services to the State"এর সমুচিত সুখ্যাতি করিয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং পরে Member of the Board of Studies in Mental and Moral

Science নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি 'অনারারী ফেলো' নিযুক্ত হইয়াছেন। 'কলিকাতা রিবিউ' নামক ত্রৈ-মাসিকে এবং 'মডার্ণ রিবিউ' নামক ইংরাজী মাসিক-পত্রে ইনি অনেকগুলি সুচিন্তিত, সারগর্ভ ও গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। শ্যামাচরণবাবু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। শ্যামাচরণবাবু অতি লাজুক ও 'মুখচোরা' ছিলেন এবং কাহারও সহিত মিশিতে ভাল-বাসিতেন না। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে থাকিতেন। হেমচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। অনেকদিন পরে, কবিতা লিখিবার পর, হেমচন্দ্র শ্যামাচরণবাবুকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার "লজ্জাবতী লতা"র idea তিনি শ্যামাচরণ বাবুর প্রকৃতি হইতে পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক যাঁহারা শ্যামাচরণবাবুর সহিত একদিনও আলাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই হেমচন্দ্রের রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন :—

"হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনী মণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটী সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন,
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !"

শ্যামাচরণবাবু বলেন বাল্যকালে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে, অনেক শনিবারই হেমচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহাদের খিদিরপুরের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। রবিবার সেখানে কাটাইয়া সোমবার পুনরায় একত্র বিদ্যালয়ে আসিতেন। হেমচন্দ্রের জননী শ্যামাচরণ বাবুকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কবির 'প্রিয় জলাশয়' পদ্মপুকুরে উভয়ে একত্র সাঁতার দিতেন।

'জুনিয়র স্কলার্শিপ' পরীক্ষা।—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র 'জুনিয়র স্কলার্শিপ' পরীক্ষা দেন।

উহা আজিকালিকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিন ছিল। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই পরীক্ষা কিরূপ ছিল তাহা জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য এই পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় ও পুস্তকাদির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ইংরাজী সাহিত্য—Goldsmith's Essays, Goldsmith's Traveller and Deserted Village.

ব্যাকরণ—Crombie's Etymology and Syntax.

দর্শন—Watts on the Improvement of the Mind.

ইতিহাস— Tytler's Elements of General History, from the commencement of the History of Greece to the effects of the discoveries of the Portuguese on the Commerce of Europe in the 15th Century.

গণিত— Euclid, Books I to IV, Arithmetic and Algebra, as far as Simple Equations

প্রাণীতত্ত্ব— Patterson's Zoology for Schools, Part I.

বাঙ্গালা— Shama Churn's Grammar.
Extracts from the Native Press of Calcutta, published by the Vernacular Literature Committee.

এই জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় শ্যামাচরণবাবু প্রথম ও হেমচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং উভয়েই দুই বৎসরের জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান। তখন বৃত্তিধারী ছাত্রগণের নিকট হইতে স্কুলের বেতন লওয়া হইত না। সুতরাং হেমচন্দ্রের বৃত্তি তাঁহাদের দরিদ্র সংসারে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিয়াছিল।

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র কলেজবিভাগে

প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে হিন্দু কলেজ 'প্রেসিডেন্সী কলেজে' পরিবর্ত্তিত হয়।

কলেজের প্রথমবার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠকালে হেমচন্দ্র আর একজন "জীবনের বন্ধু" লাভ করেন। ইহাঁর নাম তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। যখন "বাঙ্গালার আর্ণল্ড্" প্যারীচরণ সরকার বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তারাপ্রসাদ সেই সময়ে তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং জুনিয়র স্কলার্শিপ লাভ করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তারাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী কলেজের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার পরীক্ষায় ইনিই সর্ব্বপ্রথমে উত্তীর্ণ হন। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও গ্রীক্ প্রভৃতি অনেক ভাষায় ইঁহার অধিকার ছিল। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক বলিয়া অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটীতে ইনি 'চৈতন্যদেব' সম্বন্ধে যে ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন, উক্ত সভায় সাহিত্যশাখার সভাপতি অধ্যাপক কাউয়েল উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। পুরাতন পর্য্যায়ের



তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'বঙ্গদর্শনে,' অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে ইহাঁর বহু সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত স্বাধীনপ্রকৃতি ও নির্ভীকচেতা ছিলেন। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণ ইহাঁকে শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। অল্প বয়সে তারাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র, তারা-প্রসাদ ও শ্যামাচরণ বাবুর মধ্যে বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু তিন জনের পরস্পরের প্রতি বন্ধুপ্রীতিও অসাধারণ ছিল। তারাপ্রসাদের মৃত্যুর পর শ্যামাচরণ বাবু হেমচন্দ্রকে একটি শোক-গীতি (Elegy) লিখিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র যে শোক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য—

জীবনের বন্ধু মম আর একজন
কালরূপ মহাসিন্ধু সলিলে ডুবিল!
এতকাল ছিলে সখে ভূতল-রতন—
এখন এ ভবে তব কি চিহ্ন রহিল?

হায়! না দেখিব আর সে প্রিয় মুরতি!
সে ভোলা পাগল মন আপনা বিস্মৃত,

সে পাণ্ডিত্য, একাগ্রতা, সে প্রগাঢ় স্মৃতি,
অনন্ত কালের মত হয়েছে নিভৃত !

প্রকৃতি, সখা হে, তব কি মধুর (ই) ছিল,
যখনি হেরিত হিয়া হরষে ভাসিত,
জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল,
অবিরত জ্ঞানসুধা পানে বিমোহিত ।

লভিলে কতই রত্ন বিদ্যার ভাণ্ডারে !
সে জ্ঞান-পিপাসা, হায় আছে ক'জনার ?
আজীবন পর্য্যটন বাণীর বিহারে,
ভক্তচূড়ামণি, সখা ছিলে সারদার ।

হৃদয়ে বড়ই ব্যথা রহিল আমার—
দু'জনে হ'লনা দেখা শেষের সে দিন,
ছড়াইতে তব নেত্রে নিবিড় আঁধার,
যেদিন শমন করে এ বিশ্ব মলিন ।

আঁধার এ ভবরাজ্য তোমার নয়নে,
চিরদিন তরে রবি-শশী লুকাইল !
ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে ?
অথবা সে তমোজাল মানস (৩) ঢাকিল ?

* * * *

মনে কি পড়িল সখা সেদিনের কথা,
বিদ্যার সমরক্ষেত্রে যৌবনে প্রথম,

যুঝেছি কজনে যবে সহপাঠী প্রথা ?
লভিতে বিজয় কেতু কত বা উদ্যম ?

মনে কি পড়িয়াছিল পূর্ব্বের সে সব ?
দরিদ্র-বাসনা যত হৃদে হ'ত লীন ?
আশার আশ্বাসপূর্ণ বাঁশরীর রব ?
সুদূরে মধুর কিবা আকাঙ্ক্ষার বীণ ?

মনে কি পড়িল, হায় সংসার সোপানে
উঠিতে কতই ক্লেশ হরিষে বিষাদ,
হাসি কান্না সেকালের বসিয়ে নির্জ্জনে,
রহস্য কৌতুক কত অমৃত আস্বাদ।

দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার।
সেই সব ভাব আজি হৃদয়ে উঠিছে ;
বিভাবরী কোলে যেন শত তারকার
মৃদুরশ্মি ধীরে ধীরে আঁধারে ছুটিছে !

কোথায় গিয়াছ ভাই কিছুই জানি না,
অজ্ঞাত সে দেশ নরে জানে না কেহই,
প্রবেশিয়া কেহ তায় কভু ত ফেরে না,
প্রবেশ করিছে পান্থ অজস্র কতই।

যেখানেই থাক, সখে, থাক যেই ভাবে,
তমের আঁধার কিবা দিবার কিরণে,

আমাদের চিত্তমাঝে নিত্য বিরাজিবে,
আছিলে ধরণী পরে যেরূপ ধরণে।

সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত,
ডুবিল দেহের তরী ফুরাল সকলি!
ভাসিতে সাগর-নীরে তরঙ্গ-তাড়িত,
সমপাঠী এবে দুটি * রহিনু কেবলি!

অন্ধ এ জগৎ, সখা, ধরণীভূষণ
মানব যাহারা, তারা দুর্লক্ষ্য মহীর!
যশের কিরণ করে মুকুটে ধারণ
চক্রী, চাটুকার ভণ্ড কত অবনীর!

অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি? হায়,
চিনি ত আমরা—ছিলে ভবের ভূষণ!
আমরা সখা হে, সবে পূজিব তোমায়,
হৃদয় মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন।

প্রাণের বিগ্রহ হেন রাখিব যতনে,
জ্বালি স্মৃতিরূপ দীপ করিব অর্চ্চন,
প্রণয়ের ভক্তি সহ বিহ্বলিত মনে
দিব অর্ঘ্য প্রেম পুষ্প সজল নয়ন!—
মধুর পবিত্রভাব—বন্ধুর স্মরণ!

* হেমচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা। কলেজে দুই বৎসর পড়িলে সেকালের ছাত্রগণ সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইতেন। এই পরীক্ষা আজি কালিকার I. A. ও I. Sc. পরীক্ষার অনুরূপ ছিল—বোধ হয় কিছু কঠিন ছিল, কারণ, ছাত্রগণকে অনেকগুলি বিষয় পড়িতে হইত। এই পরীক্ষায় যাঁহারা উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন তাঁহারা দুইবৎসরকাল মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পাইতেন এবং কলেজে বিনাবেতনে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিতেন। হেমচন্দ্র এই বৃত্তি লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ এই বৃত্তির উপর তাঁহাদের সাংসারিক উন্নতি নির্ভর করিতেছিল। তাঁহার পিতা ইংরাজী জানিতেন না, মাতাও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে এবং তাঁহারা স্নেহ ও আগ্রহপূর্ণ নয়নে অধ্যয়ন-রত পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন এবং নীরবে মঙ্গলময়ের নিকট সন্তানের কল্যাণকামনা করিতেন। এই বিষয়ে হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হেমচন্দ্রের জননীর নিকট শ্রুত এই গল্পটি আমাদিগকে

জানাইয়াছেন :—"কৈলাসচন্দ্র ইংরাজী কিছুই জানিতেন না। পুত্রেরা ইংরাজী পড়িত, কি পড়িত তাহা তিনি কিছুই বুঝিতেন না; তথাপি, রাত্রিতে তাঁহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত পড়িতেন ততক্ষণ পিতা মাতা উভয়েই পুত্রদের দুই পার্শ্বে বসিয়া কখনও তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, কখনও বা মশা তাড়াইয়া দিতেন, আর কখনও বা পাখার বাতাস করিতেন। পিতা মাতা আহার নিদ্রা ভুলিয়া পুত্রদের পাশে বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবে কতদিন যে রাত্রি ১টা ২টা বাজিয়া যাইত তাহার সংখ্যা ছিল না।"

অবশেষে হেমচন্দ্রের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলাশিপ পরীক্ষায় হেমচন্দ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন এবং দুই বৎসরের জন্য ২৫৲ মাসিক বৃত্তিলাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট হইতে এই পরীক্ষায় সিনিয়র স্কলাশিপপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নামের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

নাম	কলেজ	বৃত্তিলাভের তারিখ	বৃত্তির মূল্য	কতদিনের জন্য	মন্তব্য
১। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সী	এপ্রিল ১৮৫৭	২৫৲	২ বৎসর	ইতিহাস ও ভূগোলে বিশেষ পারদর্শিতা এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।
২। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী	"	"	"	"	সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।
৩। ললিতবল্লভ শীল	"	"	"	"	বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা এবং সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।
৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	"	"	"	সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।
৫। যাদবচন্দ্র দে	"	"	"	"	"
৬। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"	"	"	"	"
৭। কালীমোহন গুপ্ত	"	"	"	"	"
৮। লালগোপাল দত্ত	"	"	"	১ বৎসর	"
৯। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	"	"	"	"	"
১০। নীলমণি কুমার	"	"	"	"	"

উপরি উদ্ধৃত তালিকায় প্রদত্ত নামগুলির মধ্যে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয়গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের অন্যান্য সহপাঠিগণের বিষয়ে দুই একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য সহপাঠিগণ। ললিতবল্লভ শীল ইংরাজীতে "নলিতবল্লভ শীল" এই নামে স্বাক্ষর করিতেন। ইনি সহপাঠীদিগের মধ্যে গণিত ও বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠকালে ইহাঁর অকাল মৃত্যু হয়। সপ্তাহে একদিন ছাত্রগণকে জরীপ-বিদ্যা-শিক্ষক প্রফেসর রো'র নিকট ড্রয়িং শিখিতে হইত। ললিতবল্লভ চমৎকার অঙ্কনবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের নিম্নে N. B. Seal স্বাক্ষর করিতেন বলিয়া রো সাহেব তাঁহাকে Nota Bene Seal বলিয়া ডাকিতেন। তিনি যখন তখন বাঙ্গালা ছড়া রচনা করিতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র একদিন হিন্দুছাত্রগণের গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত

উইল্‌সনসাহেবকৃত একটি কবিতার আবৃত্তি করিতে-ছিলেন—

O Ye Hindus, have ye heard
What hath recently occurred ?
The Hindu eateth beef,
The Hindu eateth beef.

ললিতবল্লভ তৎক্ষণাৎ তাহার তর্জ্জমা করিয়া শুনাইলেন—

শুনরে ভাই হিন্দুগণ
কি হয়েছে কীর্ত্তন,
গোরু খেয়েছে হিঁদু
গোরু খেয়েছে হিঁদু।

রামচন্দ্র মিত্রকে ছাত্রগণ বড় মানিত না। ইংরাজ অধ্যাপকগণের নিকট রামচন্দ্র * একজন পরম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহার

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎপ্রণীত "আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস" নামক মনোরম গ্রন্থে রামচন্দ্র মিত্রসম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিত। রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকে কবিতারচনা শিখাইবার জন্য একটি দ্বিপদীর প্রথম চরণ উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিতে বলিতেন। একদিন তিনি প্রথম চরণ আবৃত্তি করিলে, ললিতবল্লভ তাঁহার দিকে তর্জ্জনী ঈষদ্‌ভাবে হেলাইয়া এমন ভঙ্গীতে দ্বিতীয়পাদ পূরণ করিয়া বলিলেন,

"পরম পণ্ডিত তুমি ভারত ভিতর—"

যে সহপাঠিগণের পক্ষে হাস্যসম্বরণ করা অসাধ্য হইয়াছিল।

যাদবচন্দ্র দে পরে সবজজ্ হইয়াছিলেন। গোপাল-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বোর্ডের ওপিয়ম ডিপার্টমেণ্টের হেড্ আসিষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। কালীমোহন দাসগুপ্ত হেম-চন্দ্রের ন্যায় হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন এবং বাগ্মী বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। লালগোপাল দত্ত হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশসম্ভূত এবং ভবানীচরণ দত্তের ভ্রাতা ছিলেন। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের চীফ্ ইণ্টারপ্রেটার হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সদালাপী ও বন্ধুবৎসল

ছিলেন। সকল সহপাঠীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। শিক্ষকগণের প্রতি হেমচন্দ্র শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং ছাত্রজীবনে কখনও কোন অন্যায় আচরণ করেন নাই। কেবল একবার মাত্র ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সে ঘটনাটী হেমচন্দ্রের সতীর্থগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি সেইভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একটি অশিষ্ট আচরণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনাপ্রণালী সম্বন্ধে ছাত্রগণের উচ্চ ধারণা ছিল না। হেমচন্দ্র যে শ্রেণীতে পড়িতেন, তাহার অব্যবহিত উচ্চ শ্রেণীতে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য * নামে এক ছাত্র ছিলেন। ইনি একদিন রামচন্দ্রের অযোগ্যতার প্রমাণসমর্থক দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ করিয়া একটি আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিলেন এবং উহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীর সকল ছাত্রের স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। হেমচন্দ্রও সকলের সহিত উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আবেদনপত্র পাইয়া সাটক্লিফ

* ইনি ' ারে ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন।



রামচন্দ্র মিত্র

সাহেব মহাক্রোধান্বিত হইলেন। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সাটক্লিফ সাহেবের খুব ভাল ধারণা ছিল এবং হেমচন্দ্র বৃত্তি পাইবার পূর্ব্বে সাটক্লিফ স্বয়ং তাঁহার স্কুলের বেতন পর্য্যন্ত দিতেন। শ্যামাচরণ বাবু বলেন যে, সাটক্লিফ্‌কে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হেমচন্দ্র অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সাটক্লিফ সাহেব এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আবেদনকারী ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগের নেতা ক্ষেত্রনাথকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ হাবড়া স্কুলে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। ভূদেব বাবু রামচন্দ্র মিত্রকে ছাত্রগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র ছাত্রগণকে মার্জ্জনা করেন এবং ক্ষেত্রনাথকে শাস্তিপ্রদান না করিতে সাটক্লিফকে অনুরোধ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইলে হেমচন্দ্র পরীক্ষা প্রদান করেন এবং সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

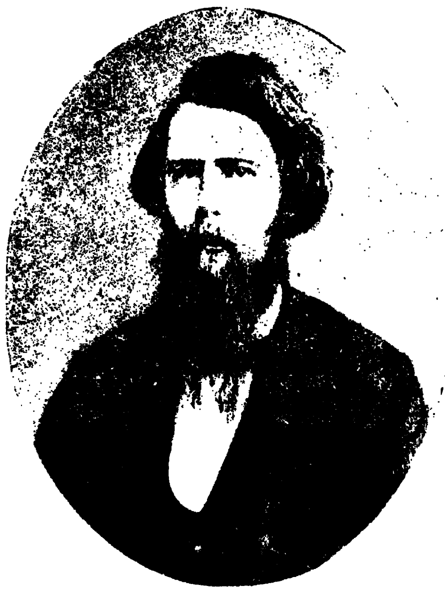
তর্কসভা। "শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত।"—হেমচন্দ্র কলেজে যে শ্রেণীতে পড়িতেন, (রায় বাহাদুর) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,কেশবচন্দ্র সেন ও (স্যর) চন্দ্রমাধব ঘোষ তাহার অব্যবহিত উচ্চশ্রেণীতে এবং (স্যর) রমেশ-চন্দ্র মিত্র, (রায় বাহাদুর) কালিকাদাস দত্ত ও (রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তাহার অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেন। হেমচন্দ্র যে বৎসর জুনিয়র স্কলাশিপ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর কেশবচন্দ্র কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার সময় অপর এক ছাত্রের উত্তরপত্র নকল করিতেছিলেন বলিয়া পরিদর্শক কর্তৃক ধৃত ও অপমানিত হন।* কেশবচন্দ্রকে কলেজ হইতে চিরবহিষ্কৃত করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিষে তাঁহাকে অতিরিক্ত ছাত্র-রূপে কলেজে পাঠ করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। এই ঘটনার পর কেশবচন্দ্র আর কখনও কোন পরীক্ষা প্রদান করেন নাই—কিন্তু অতিরিক্ত ছাত্ররূপে কলেজে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ

* শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কেশবচন্দ্র সেনের ইংরাজী জীবন চরিতে এই ঘটনার ইঙ্গিত আছে।



কেশবচন্দ্র সেন

অনুরাগ ছিল এবং দর্শনের অধ্যাপক কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে,যখন তিনি ও হেমচন্দ্র কলেজের তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়েন তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কেশবচন্দ্রকে সহপাঠিগণ সকলেই ভালবাসিতেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কলেজে একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন। কলেজের অধ্যাপকগণ, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্, এবং কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ কটনের Domestic Chaplain মিষ্টার বার্ণ এই সভার কার্য্যে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কেশবচন্দ্র, তারাপ্রসাদ, নীলমণি বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু প্রভৃতি এই সভায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। হেমচন্দ্রও এই সভায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত" বিষয়ক একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেণ্ড লঙ্ উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা'র তাৎকালীন সম্পাদক মিষ্টার ফর্ব্‌স্ উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের



অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল

সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

শিক্ষকগণের প্রভাব। হেমচন্দ্রের চরিত্রগঠনে যে সকল শিক্ষক মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাপক কাউয়েল ও অধ্যক্ষ ক্লিণ্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিলে কাউয়েল পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের উপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় অধ্যাপক কাউয়েলের একটি সুলিখিত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বিষয় বিশেষভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। হেমচন্দ্র কাউয়েলের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ সাটক্লিফ্ অবসর গ্রহণ করিলে মিষ্টার এল্,

ক্লিণ্ট তাঁহার পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। ইনি অতি সাধু ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ছাত্রগণের চরিত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিতেন। হেমচন্দ্রের একজন সহপাঠী বলেন, হেমচন্দ্র বলিতেন যে তিনি ভবিষ্যতে হাইকোর্টের উকীল হইয়া কখনও অর্থলাভের জন্য যে অসাধু উপায় অবলম্বন করেন নাই—তাহা ক্লিণ্ট-প্রদত্ত শিক্ষার ফল। সকল ছাত্রই ক্লিণ্টকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ক্লিণ্ট কঠোর শাসননীতির পক্ষপাতী হইলেও নিরন্তর তাহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।—পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা কাব্যাদি পাঠে হেমচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে, হেমচন্দ্র প্রায়ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' পাঠ করিতেন এবং বোধ হয় 'প্রভাকরে'র জন্য দুই একটি কবিতাও লিখিয়া থাকিবেন। হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে একবার হেমচন্দ্রের খিদিরপুরস্থ ভবনে লইয়া গিয়া হেমচন্দ্রই তাঁহাকে

প্রথম ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়াইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্যাদি পাইলে হেমচন্দ্র তাহা সাগ্রহে বারম্বার পাঠ করিতেন। নীলমণি বাবু বলেন, একবার তিনি হেমচন্দ্রকে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন পাঠ করিতে দেন। হেমচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া বলেন, "রামেশ্বর is a genuine poet", এবং এত আনন্দিত হন যে নীলমণি বাবুকে বলেন, তিনি যেন ঐ পুস্তক ফেরত পাইবার আশা না করেন। কাশীরাম ও কৃত্তিবাস হেমচন্দ্র বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র কাশীরামের নিকট তাঁহার অশেষ ঋণের কথা, শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণের নিকট পরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

শ্যামাচরণ বাবু চিরদিনই চলিতভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। হেমচন্দ্র রচনায় সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষ-পাতী ছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালে একদা শ্যামাচরণ বাবু হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "সাধুভাষায় বাদুড়কে কি বলিবে?" রহস্যপ্রিয় হেমচন্দ্র হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "কেন—বদ্দ্ড় !"

ভাষা সম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবুর সহিত হেমবাবুর মধ্যে মধ্যে তর্ক হইত। কলেজ পরিত্যাগের পর শ্যামাচরণ

বাবু হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র ও আর দুই চারিজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত ভারতবর্ষময় হিন্দীর প্রচার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। শ্যামাচরণ বাবুর মত ছিল যে হিন্দীভাষা ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগী হেমচন্দ্র হিন্দীর একাধিপত্য স্থাপনের বিরোধী হইয়াছিলেন। তর্ক করিতে করিতে একবার শ্যামাচরণ বাবুর প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,সুবিধা দেখিতে গেলে হিন্দী না হইয়া ইংরাজীই ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হওয়া উচিত।

কেরাণীগিরি। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠ করিতে করিতে হেমচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজের ২৫৲ ছাত্রবৃত্তি দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শীঘ্র বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁহাকে চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। সতীর্থ নীলমণি কুমার তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব বিভাগে (Military Auditor General's Office) প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেকালে এই সকল আফিসে বাঙ্গালী কেরাণীরা বেশী বেতন পাইতেন না।

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বনামধন্য সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষই সর্ব্বপ্রথমে এই বিভাগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উচ্চপদ অধিকৃত করেন এবং বাঙ্গালী কেরাণীর পক্ষে সেই সকল পদপ্রাপ্তি সম্ভব করিয়া দেন। নীলমণি বাবু আফিসের রেজিষ্ট্রার রবার্ট হলিংবেরীর সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ সিপাহীযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই, এই বিভাগে অনেক কর্ম্মচারীর আবশ্যকতাও ছিল। সুতরাং নীলমণি বাবুর সাহায্যে উচ্চশিক্ষিত হেমচন্দ্র অনায়াসেই এই বিভাগে ৩৫৲ বেতনের একটি কেরাণীর পদ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অতিশয় প্রিয়পাত্র, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও, বোধ হয়, হেমচন্দ্রকে অফিসে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকারী রূপে নিযুক্ত হইলেন। এই পদপ্রাপ্তিতে হেমচন্দ্রের পরিবারের অর্থকষ্ট কিছু ঘুচিল। কিছুদিন পরে সহপাঠী শ্যামাচরণ বাবুও এই আফিসে প্রবেশ করেন।

বি-এ উপাধিলাভ। সংসারের দারিদ্র্য দূর

করিবার জন্য অল্পবয়সেই হেমচন্দ্রকে চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত হেমচন্দ্রের জ্ঞানানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। হেমচন্দ্র আজীবন বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত বিদ্যানুশীলন করিতেন। সকল সময়েই তাঁহার হস্তে কোন না কোন পুস্তক থাকিত। এমন কি, প্রৌঢ় বয়সে আহারের সময়েও তিনি অনেক সময় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে আহার করিতেন। এজন্য আহার করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে যখন হেমচন্দ্র কেরাণীর কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ধনী প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র এবং সতীর্থ তারাপ্রসাদ নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তৎকাল-প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বি-এ পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তিনি অবিচলিত উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে অবসর কালে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল,

দশজন ছাত্র সেই বৎসর বি-এ উপাধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তিনজন ছাত্রের মধ্যে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথম, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় ও ভোলানাথ পাল তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শ্যামাচরণ বাবু অসুস্থতাবশতঃ পূর্ব্ব বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া এই বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার মাত্র বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল এবং সে বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু এই দুইজন মাত্র ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কেহই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের সময়ে বি-এ পরীক্ষায় অনেকগুলি বিষয় পাঠ করিতে হইত। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এই বৎসরের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকাদির ও পরীক্ষকগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

ইংরাজী সাহিত্য—Milton's Paradise Lost,
Books I to VI.
Pope's Essay on Criticism.

(পরীক্ষক জি. স্মিথ এবং ই. বি. কাউয়েল)	Gray (as in Richardson's Selections) Defoe's History of the Plague. Macaulay's Essays—War of Succession in Spain, William Pitt, The Earl of Chatham.
বাঙ্গালা— (পরীক্ষক রামচন্দ্র মিত্র)	প্রবোধ-চন্দ্রিকা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ১ম, ২য় ও ৩য় কাণ্ড।
ইতিহাস— (পরীক্ষক জি. গ্রেভ্স্ এবং মেজর ডব্লিউ. এস্. শারউইল)	Principles of Historic Evidence as in Isaac Taylor's two works on the subject and other similar works. History of England, including that of British India, to the end of 1815. Elphinstone's History of India, Ancient History, with special reference to the

History of Greece, to the death of Alexander; the History of Rome, to the death of Augustus and the History of the Jews. (Historical questions will include the Geography of the countries to which they refer).

গণিত— (পরীক্ষক ডব্লিউ. এস্. এটকিন্সন্)	Arithmetic and Algebra. Geometry Books I-VI & XI. Plane Trigonometry. Mechanics. Hydrostatics. Hydraulics and Pneumatics. Optics. Astronomy.
বিজ্ঞান— (পরীক্ষক ডাক্তার ডব্লিউ. ক্রোজিয়ার)	Chemistry. Animal Physiology. Physical Geography.
দর্শন—	Logic (Whately)

(পরীক্ষক আর্. এল্. মার্টিন)	Moral Philosophy (as in Wayland, Abercrombie or similar works)
	Mental Philosophy (as in Abercrombie, Dr. Payne or similar works).

হিসাব-বিভাগের কেরাণীর 'হাড়ভাঙ্গা খাটুনী'র উপর এইরূপ দুরূহ পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করা হেমচন্দ্রের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

বিবাহ। তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। শ্যামাচরণবাবু বলেন যখন কলেজের প্রথমবার্ষিকী শ্রেণীতে তিনি পড়িতেন (১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দ) এবং হেমচন্দ্রের সহিত প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার খিদিরপুরস্থ ভবনে বেড়াইতে যাইতেন, তখনই হেমচন্দ্র বিবাহিত। হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী ভবানীপুর নিবাসী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতমা দুহিতা। তিনি অশিক্ষিতা ও অল্পবুদ্ধি হইলেও, অতিশয় সুন্দরী, সরলা, ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন।



হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী

(ক্রোড়ে কনিষ্ঠা কন্যা)

বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রতিভাশালী হেমচন্দ্রের উপযুক্ত না হইলেও, হৃদয়ের গুণে তিনি তাঁহার উদার-হৃদয় স্বামীর সম্পূর্ণ যোগ্যা ছিলেন। বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্র এই 'কামিনী'-কুসুমের মর্য্যাদা বুঝিতেন,

"কোথা হেন শতদল,
হৃদে পুরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে?"—

এবং জীবনের মধুর উষায় এই জীবন-সঙ্গিনীর হস্তধারণ করিয়াই অনেক আকাঙ্ক্ষা ও সুখস্বপ্ন লইয়া হেমচন্দ্র সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন :—

"প্রবেশি সংসারে যবে, কি সুখের কাল!
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে!
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া;
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায়!"

—*—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাইকোর্টে প্রবেশ। সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল—
"চিন্তা-তরঙ্গিণী"।

অধ্যাপনা। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল। যাঁহারা হেমচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন এবং তাঁহার চরিত্র সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হেমচন্দ্রের অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। দরিদ্রের সন্তান সচরাচর সরকারী আফিসে সামান্য চাকুরী পাইলেই জীবন সার্থক বলিয়া মনে করে। কিন্তু হেমচন্দ্র দেশের ও সমাজের সেবা করিবার অধিকতর অধিকার লাভের জন্য চিরদিন আপনার সম্মুখে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়াছিলেন এবং আজীবন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে আত্মোন্নতি দ্বারা সেই উচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বি-এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর কেরাণীগিরি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা হেমচন্দ্রের আদৌ ছিল না।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, মাধবচন্দ্র ধর, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং বৈষ্ণবচরণ আঢ্য এই কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শঙ্কর ঘোষের লেনে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামক এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে ইঁহারাই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন। পরে বিখ্যাত ধনী শ্যামা-চরণ মল্লিক মহাশয় উহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয় নিজ আয়ে চলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র হেমচন্দ্র হিসাব বিভাগের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে উহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েটে কর্ম্ম করিয়া তখন পেন্সন পাইতেছিলেন। ভবিষ্যতে যে চাকুরীতে উন্নতি ও পেন্সনের আশা ছিল, হঠাৎ সেই চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্র বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নাই, একথা ঠাকুরদাস হেমচন্দ্রকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্বয়ং বিদ্যালয়ের

কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে,এ বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে পরিদর্শনের ভার দিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক অবসর ছিল। সুতরাং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বিদ্যাসাগর ও (টেলিমেকস','নীতিপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা) পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহারা অনুরোধপালনে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য করিয়া লইলেন।

পরে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ একে একে অবসর গ্রহণ করিলে উহার সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে আসিয়া পড়ে এবং উহা "মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউ-সনে" পরিণত হয়।

হেমচন্দ্র অতি সুচারুরূপে এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যক্ষগণের প্রশংসাভাজন হন।

রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহশিক্ষক। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রমাপ্রসাদ রায় * তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জন্য একজন উত্তম গৃহশিক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বোধ হয় রমাপ্রসাদের স্বগ্রামনিবাসী ও স্নেহভাজন শিষ্য প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সুপারিষে, রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যের পর অবসরকালে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদের দুইপুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহনকে পড়াইতেন।

সহৃদয়তার একটি দৃষ্টান্ত। যখন হেমচন্দ্র ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা আমরা হেমচন্দ্রের সতীর্থ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। সেই ঘটনা হইতে হেমচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়া আমরা এইস্থানে উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

---

* সন ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে "নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক ইঁহার জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল।



রমাপ্রসাদ রায়

(মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমতিক্রমে 'মহাতাপ মঞ্জিলে'

রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে,)

জ

হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্র অতিশয় কোমল-হৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। একদা বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ পড়িয়া গিয়া হস্তে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। হেমচন্দ্র তদ্দর্শনে অতিশয় বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহাকে গাড়ী করিয়া মেডিক্যাল কলেজে লইয়া যান। তখন স্বনামধন্য চিকিৎসক (পরে রায়বাহাদুর) সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাব-ধানে নিযুক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র সোদরোপম সূর্য্যকুমারকে দেখিয়া আশান্বিত হইলেন এবং বালকটীকে শীঘ্র পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি দিতে অনুরোধ করিলেন। সূর্য্যকুমার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "This is an interesting case of compound fracture." সূর্য্যকুমারকে ধীর ও শান্তভাবে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে উক্ত মন্তব্য উচ্চারণ করিতে শুনিয়া পর-দুঃখনিবারণার্থ অধীরহৃদয় হেমচন্দ্র কিছু বিরক্ত হইয়া বলেন, "তোমরা ত বেশ লোক। একজনের যখন প্রাণ যায় তখন তোমরা Interesting case বলিয়া Experiment কর?" পরে হেমচন্দ্র প্রায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া চিকিৎসকগণের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি অনুযোগ করিতেন।



রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

এইস্থানে সূর্য্যকুমারের সহিত হেমচন্দ্রের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সখ্যতা ছিল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বিবৃত করা যাইতে পারে। এ গল্পটি হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের জননীর মুখে শুনিয়াছিলেন এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই :—

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহিত হেমচন্দ্রের আবাল্য-প্রণয় ছিল। বাল্যকালে সূর্য্যকুমার হেমচন্দ্রের বাটীতে আসিলে হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী আচলে মুড়ী রাখিতেন এবং দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তাহা খাইতেন। যখন উভয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ সম্মান ও যশোলাভ করিয়াছিলেন, তখনও সূর্য্যকুমার হেমচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া সময় সময় সেই শৈশবের সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আনন্দময়ীকে বলিতেন, "মা, আপনি আজ আবার আঁচলে মুড়ী লইয়া বসুন, আমরা আবার দেখি,—ছেলেবেলার মত দু'জনে আপনার আঁচল হইতে মুড়ী লইয়া খাই।" হেমচন্দ্রের জননী তাহাই করিতেন, দুইবন্ধু তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া কত কথা কত গল্প করিতে করিতে তাহা আহার করিতেন। কি সুন্দর, কি মধুর সে দৃশ্য!

এই সুখ-চিত্র হেমচন্দ্রও একস্থানে তাঁহার নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন :—

"পড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,
'মা' 'মা' বলি প্রবেশি আলয়,
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা !
সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এস সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা !"

বি-এল্, পরীক্ষা। যখন হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, তখন রমাপ্রসাদ ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমাজে তাঁহার অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা। বোধ হয়, তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই হেমচন্দ্র ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসুক হন। তিনি তাঁহার বিরলপ্রাপ্ত অবসরকাল ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। খিদিরপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষকতা, রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণকে শিক্ষাদান এবং নিজের ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন, এতগুলি কার্য্য সম্পাদন করিতে অসুবিধা হয়

বলিয়া এই সময়ে তিনি চাঁপাতলায় একটি 'মেসে' কিছুকাল অবস্থান করেন। কুচবিহারের ভবিষ্যৎ দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর এই সময়ে এই 'মেসে' থাকিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

কালিকাদাস বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল। কালিকাদাস বাবু কৃষ্ণনগর হইতে জুনিয়ার স্কলার্শিপ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন, তখন তিনি খিদিরপুরে এক ভদ্রপরিবারের মধ্যে বাস করিতেন। এই সময় হইতেই হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। কালিকাদাস বাবুর অপ্রকাশিত আত্মচরিতের অনেক স্থলে হেমচন্দ্রের নামোল্লেখ দেখা যায়। কালিকাদাস বাবুর অন্যতম পুত্র, হাইকোর্টের উকীল, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা তাঁহার মনোরম ও কৌতূহলপ্রদ আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইলাম :—

"খিদিরপুর হইতে ছেক্‌রা গাড়ীতে কলেজ যাইতে হইত। কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী ছিল। গাড়ীতে তাঁহার পুত্র হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র কলেজ যাইত। আমিও



রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, সি-আই-ই

গাড়ীর এক অংশ চারিটাকা মাসিক দেওয়ার অঙ্গীকারে ভাড়া করি। মোটে গাড়ীতে ছয়টি ছাত্র যাইত। ইহাতে কি প্রকার সুখে যাইতাম তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু তখন কষ্টে কষ্টবোধ হইত না। সমস্তই সুখময় বোধ হইত। গাড়ীর ঘোড়া দুইটী অতি দুর্ব্বল ছিল। তাহারা খিদিরপুরের পুলে উঠিতে বিশেষ আপত্তি করিত। হুসেন কোচম্যান একবার কে'চবাক্স হইতে কশাঘাত করিত, পরে আবার নামিয়া অশ্বদের মুখ ধরিয়া টানিত। এই প্রকার অনেক যত্ন করিলে পুলে উঠা যাইত। কিন্তু তাহার পর আর গোল হইত না। হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। তাঁহারা উভয়েই অতি বুদ্ধিমান ও নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহাদের পিতা ও মাতা আমাকে স্নেহ করিতেন। এই হেমচন্দ্রই এক্ষণে বঙ্গের এক মহাকবি। তাঁহাদের অবস্থা আমার অপেক্ষা অতি মন্দ ছিল। কিন্তু অধ্যবসায়ের গুণে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া বি-এ ও বি-এল্ পরীক্ষা উত্তমরূপে দিতে সক্ষম হন ও হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে আমার অনেক উপকার হইয়াছিল।"

*   *   *   *

"গৃহস্থ বাটীতে সাড়ে আট বা নয়টার সময় প্রস্তুত অন্ন পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। বাটীর মেয়েরা কোন মতে ভাত ও একটা কোন প্রকার তরকারী দিত। কখন কখন এমত ঘটিত যে হেমবাবুরা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া রাস্তা হইতে 'কালিকাদাসবাবু,

কালিকাদাসবাবু' বলিয়া ডাকিতেন। আমি অর্দ্ধভোজন করিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিতাম।"

* * * *

"খিদিরপুর থাকার সময় হেমবাবু আমার সহিত গ্রীষ্মাবকাশে একবার বল্লা* গিয়াছিলেন। দুইজনে দুইটি পুস্তক ও বস্ত্রের ব্যাগ লইয়া আনন্দ মনে গমন করি। তখন বর্দ্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর পিশাচের আগমন হয় নাই। বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটস্থ একটি দোকানে জলপান করিয়া কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে ঐ জলে মিছরী কি ওলা দেওয়া ছিল কি না। অমিশ্রিত নির্ম্মল জল তখন এত সুমিষ্ট ছিল! রৌদ্রের সময় পথিমধ্যে দুইজনে যাইয়া একটি আমবাগানে আম পাড়িয়া খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণের কথা এখনও মনে আছে।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল্ পরীক্ষা দেন। কিন্তু অবসরের অল্পতাবশতঃ পাঠে তিনি তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া বি-এল্ উপাধিলাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং পরীক্ষক তাঁহাকে এল্-এল্ উপাধিলাভের যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র এবং অধ্যক্ষ সাটক্লিফের

* কালিকাদাস বাবুর মাতুলালয়।

অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাটক্লিফ সাহেব পরীক্ষককে তাঁহার কাগজ পুনরায় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন এবং হেম-চন্দ্রকে সেই পত্রখানি পরীক্ষকের নিকট লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। হেমচন্দ্র তরুণবয়সসুলভ কৌতূহলবশতঃ লেফাফা হইতে উক্ত পত্রখানি খুলিয়া পড়েন এবং খুলিবার সময় লেফাফাখানি ছিঁড়িয়া ফেলেন। অতঃপর সেই ছিন্ন লেফাফাখানি লইয়া পরীক্ষকের নিকট যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সেই পত্র-খানি তাঁহার কাছে লইয়া যান নাই। যথাসময়ে ফল প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর রমেশচন্দ্র মিত্র, কালিকাদাস দত্ত প্রভৃতি আট জন ছাত্র বি-এল্ উপাধি লাভ করেন এবং একমাত্র হেমচন্দ্র এল্-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হন।

১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নূতন নিয়ম* হয় যে, যে সকল এল্-এল্ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র

---

* "Any Licentiate in Law who has graduated in Arts, may, on paying the usual fee, be admitted to the Degree of Bachelor in Law without further examination."

গ্রাজুয়েট হইয়াছেন তাঁহারা ৩০৲ টাকা ফি দিলেই বি-এল্ উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ৩০৲ টাকা জমা দিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি-এল্ উপাধি লাভ করেন। হেমচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বলিতেন, "কেবল ত্রিশ টাকা দিয়া আমি বি-এল্ হইয়াছি, পরীক্ষা দিয়া বি-এল্ হই নাই।"

মুন্সেফী।—এল্-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র শিক্ষকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্থানে রমাপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলরত্ন। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের বিচারবিভাগে কর্ম্ম পাইতে হেমচন্দ্রকে অধিক আয়াস পাইতে হয় নাই। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরে এবং পরে হাবড়ায় ১০০৲ একশত টাকা মাসিক বেতনে প্রতিনিধি মুন্সেফরূপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র অধিককাল মুন্সেফী করেন নাই। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে, যে কারণে হেমচন্দ্র

চাকুরী পরিত্যাগ করেন তাহা তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। একবার কোন মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পান। তাহাতে তাঁহাকে রায় প্রকাশ করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে অথবা উকীলদের নির্ব্বুদ্ধিতায় অনেক সময় সত্যনির্দ্ধারণ দুষ্কর হইয়া উঠে। নীলমণিবাবু বলেন, এই জন্যই তিনি মুন্সেফী পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিতে সঙ্কল্প করেন। অপর কেহ কেহ বলেন, সুদূর প্রবাসে সন্তানকে যাইতে দিতে তাঁহার স্নেহময়ী জননী আপত্তি প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র চাকুরী পরিত্যাগ করা বিধেয় বলিয়া মনে করেন। স্বয়ং হেমচন্দ্রের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ও যে প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে কাতর হইয়াছিল, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। তাঁহার এক কাব্যের একস্থানে নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে তিনি যে তাঁহার নিজেরই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই :—

"যেই জন শিশুকালে, মা বলে জননী কোলে,
ছুটাছুটি করে আসি স্তন্যপান করেছে।

সেই জন নিশাভাগে, নারী সনে অনুরাগে
নিরমল পূর্ণমাসী-শশধরে হেরেছে॥
পীড়াতুর শয্যাগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,
হয়ে সেবা প্রিয়জন প্রিয়ভাষা শুনেছে।
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে॥"

হাইকোর্টে প্রবেশ ও নর্টনের Law of Evidence অনুবাদ।—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ দিবসে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার কিছুদিন পরেই ওকালতী আরম্ভ করেন। হাই-কোর্টে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কাহারও প্রসার প্রতি-পত্তি হয় না—সকলকেই কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। হেমচন্দ্র ধনী ছিলেন না এবং মুন্সেফী পরিত্যাগ করায় তাঁহার আর্থিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই সময়ে হেমচন্দ্র অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি কায প্রাপ্ত হন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন, গবর্ণমেণ্ট (শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার বলেন, বোধ হয় বিখ্যাত আইন গ্রন্থ প্রকাশক মেসার্স হে এণ্ড কোং) এই সময়ে Norton's Law of Evidence নামক ইংরাজী আইন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত করিবার জন্য উদ্যোগী

হইয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রকেই উপযুক্ত পাত্রবোধে তাঁহাকে উচিত পারিশ্রমিক (বোধ হয় ১৫০০৲ বা ২০০০৲) দিয়া এই গ্রন্থের অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং হেমচন্দ্রকে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া একেবারে আয়শূন্য হইতে হয় নাই।

'চিন্তাতরঙ্গিণী।'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে হেমচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং স্বয়ং মধ্যে মধ্যে কবিতাদি রচনা করিতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠাগ্রজ সুপণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য আত্মহত্যা করেন। ইহার কিছুদিন পরে হেমচন্দ্রের বাল্যসুহৃদ শ্রীশচন্দ্র তাঁহার পিতার কোন আদেশ তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া পালন করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন এবং গুরুজনের আদেশলঙ্ঘনরূপ মহাপাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য আত্মহত্যা-রূপ আর একটি মহাপাপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শ্রীশচন্দ্র যে কখনও এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবেন একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। শ্যামাচরণ বাবু বাল্যাবধি অতিশয় রুগ্ন ছিলেন অথচ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় উচ্চ ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা কখনও সার্থক হইবে না বলিয়া মধ্যে

মধ্যে তাঁহার আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি হইত এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের সমক্ষে মধ্যে মধ্যে এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করিতেন। শ্রীশবাবুই তাঁহাকে বলিতেন আত্মহত্যা মহাপাপ, কদাচ ওরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। হেমচন্দ্র বলিতেন "আত্মহত্যা is sheer cowardice."

শ্রীশচন্দ্রের এই আকস্মিক আত্মহত্যায় হেমচন্দ্র অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হন, কারণ, হেমচন্দ্রই লিখিয়াছেন,

"শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়,
জ্ঞানিচিত্ত-শোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে।"

এবং এই শোকের আবেগেই তাঁহার প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' লিখিত হয়। শোকের পবিত্র উচ্ছ্বাসে অনেক প্রসিদ্ধ কবির কাব্য-উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। শোকের আবেগেই মহাকবি মিল্টনের 'Lycidas', শেলীর 'Adonais', টেনিসনের 'In Memoriam,' এবং ম্যাথু আর্ণল্ডের 'Thyrsis' রচিত হইয়াছিল।

'চিন্তাতরঙ্গিণী' কাব্যের মুখপত্রে কবি এই কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন :—

'পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য, মনুষ্যের সার পদার্থ মন।'

ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় যুবক হেমচন্দ্রের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ আজিকার কাব্যের উন্নত আদর্শ লইয়া বিচার করিলে উহার প্রতি অন্যায় করা হইবে। উহার প্রকাশকালে বাঙ্গালায় সুরুচিসম্পন্ন ও সুললিত কাব্যগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। রঙ্গলালের একখানিমাত্র গ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তখন প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা কি ইংরাজীশিক্ষিত, কি ইংরাজী-অনভিজ্ঞ সকলের নিকটেই সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। মাইকেলের 'তিলোত্তমা' এবং বোধ হয় 'মেঘনাদবধ'ও এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু "অকাল-কোকিল" মধুসূদনের কাব্য উপভোগ করিবার জন্য তখনও বাঙ্গালী পাঠক প্রস্তুত হন নাই। সুতরাং হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' পাঠকসমাজে বোধ হয় কিছু অতিরিক্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল (বোধ হয়, হাবড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নিবাসী শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত 'হাবড়া হিতকরী' পত্রে) উহার একটি প্রশংসাসূচক সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের দুই একস্থলে ইংরাজী কবিদিগের ভাবসঙ্কলন আছে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল সমালোচন প্রসঙ্গে দেখাইয়া দেন যে হেমচন্দ্রের

'কেন বা হইবে আন—পুরুষের শত টান' ইত্যাদি

বায়রণের "Man's love, of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I.) ইত্যাদির অনুবাদ।

তৎকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠযোগ্য নির্দোষ কাব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থ কলেজের পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, হেমচন্দ্রের শিক্ষাগুরু কাউয়েলও এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। উভয়ের চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

"চিন্তাতরঙ্গিণী"তে ভারতচন্দ্র ও কাশীরামের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বাল্যরচনাসুলভ দোষাদি বর্ত্তমান থাকিলেও উহার স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি উচ্চভাব-সম্বলিত পদ আছে যে তাহা বাঙ্গালার সুভাবিত-সংগ্রহে চিরদিন স্থান পাইবার যোগ্য। "দেবের অসাধ্য রোগ—চিন্তার বিকার"-গ্রস্ত গ্রন্থনায়ক দেখিতেছেন সংসার নরক-সদৃশ,

"সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান॥

দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা. প্রতিহিংসা কোপ অনিবার॥"

তিনি বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা॥
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী জুড়িয়া।
নূতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া॥"

তাঁহার দুঃখ,—

"দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু॥
* * * *
মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই॥"

তাঁহার মতে,—

"————অসার সংসার।
দণ্ড দুই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার॥
ভবের এ নাট্যশালা ছায়াবাজী প্রায়।
দিন দুই ধূমধাম পরেতে ফুরায়॥"

পুনশ্চ :—

"বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্ত্তের তরে॥
অমানিশা, তাহে মেঘ, কালির বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন॥"

কবির প্রবোধবাক্য বা উত্তর কি উত্তেজনাময়ী ও পুরুষোচিত—

"কি ছার পাপের ঢেউ দেখি, ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্য্য ধর॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥
সেইরূপ সাধুজন সংসার ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থির ভাব আপনার ভরে॥
কিছুকাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন॥"

অপর একস্থলে কবি বলিতেছেন,—

"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণমাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখে হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥"

বর্ত্তমান প্রস্তাবে হেমচন্দ্রের এই বাল্যরচনার বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান নাই। এই কাব্যগ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে কবির তাৎকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসের ছায়া

পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই জন্য সেগুলির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম :—

"দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি প্রতিমা দশভূজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজয়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্ম নাম।
মুক্তি পদ জানি সেই পরব্রহ্ম ধাম॥"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---*---

'মেঘনাদবধ'-সমালোচনা ও 'বীরবাহু কাব্য'।

কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি।

'মেঘনাদবধ'-সমালোচনা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রকাশকালে উহার দোষ গুণ লইয়া যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের তদ্রূপ আলোচনা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। নূতনত্বের বিরোধী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সমালোচনার শাণিত অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যের অভিনবত্বের জন্য গ্রন্থখানি বিক্রয় হইয়াছিল। মধুসূদনের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির চেষ্টায় উহা কোন কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। সেই জন্য এক বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সহস্র খণ্ড পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া গ্রন্থের দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের অধিকতর উপযোগী করিবার জন্ম এবং বিপক্ষবাদিগণকে কাব্যসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের সংস্কার দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কনকালে 'মেঘনাদবধে'র বিস্তৃত টীকা ও সমালোচনা সম্বলিত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন হেমচন্দ্র তখন একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া, অপর একখানি কাব্যরচনায় উন্মুখ ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী বলিয়া বন্ধু সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হয়, এবং হেমচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রবোধে 'মেঘনাদবধে'র টীকা ও ভূমিকা প্রণয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধের' বিস্তৃত টীকা ও সন ১২৬৯ সাল ১০ই শ্রাবণ তারিখ সম্বলিত একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই ভূমিকা পাঠে প্রতীত হয় যে, "লেখক স্বয়ং একমাস পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করেন নাই।" এই ভূমিকার শেষভাগে হেমচন্দ্র "গ্রন্থকারের স্বহস্ত প্রস্তুত টিপ্পনী দৃষ্টে" মধুসূদনের "জীবন

চরিত ঘটিত 'গুটিকত কথা"ও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তদ্বিরচিত 'কবি হেমচন্দ্র' শীর্ষক গ্রন্থের একস্থানে হেমচন্দ্রের এই ভূমিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"সুদীর্ঘ ভূমিকায় হেমচন্দ্র বাঙ্গালীকে নবপ্রবর্ত্তিত 'মিতাক্ষর' বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন,—বড় আগ্রহে, বড় উৎসাহে, বড় অনুরাগে, বড় ব্যাকুলতা সহকারে। * * * 'মধু'ময় মিতাক্ষর বুঝাইবার সেই আগ্রহ, দুর্ব্বোধ মধু-কূট বুঝাইবার জন্য টীকায় সেই যত্ন—উকীলের ওকালতি বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হইল, হেমচন্দ্র মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য।"

হেমচন্দ্রের ভূমিকা প্রণয়নের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে, অক্ষয়চন্দ্র যখন উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তখন মূল ভূমিকাটি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়াছিলেন কিনা, কিম্বা তাঁহার স্মৃতিশক্তি কতদূর প্রখর ছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। মন্তব্যটি পাঠ করিলে মনে হয় যে হেমচন্দ্রের ভূমিকাটি মধুসূদনের কাব্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু হেমচন্দ্রের ভূমিকায় নিরপেক্ষ ও স্বাভাবিক বিচার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিকে মধুসূদনের কবিত্ব শক্তির দুই

প্রধান গুণ—তেজস্বিতা ও উদ্ভাবকতার—যেরূপ উচ্চ সুখ্যাতি করিয়াছেন, অন্যদিকে মধুসূদনের কাব্যের দোষগুলিও প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। 'সময়ের অনাটন জন্য' সবিস্তার সমালোচনা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যতদূর সম্ভব তিনি মধুসূদনের কাব্যের প্রধান প্রধান দোষ-গুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রথমবারে হেমচন্দ্র যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, পরে (বোধ হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই পরি-বর্ত্তিত ভূমিকাটি মেঘনাদবধের প্রচলিত সংস্করণ গুলিতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। আমরা প্রথম সংস্করণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, ভূমিকা প্রণয়ন কালে মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের কিরূপ অভিমত ছিল তাহা প্রকটিত করিতেছি :—

"মাইকেল, মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির, বুঝি, ইয়ত্তা নাই। * * * বুঝিবা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব শক্তি, তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে আর ত তার কথাই ছিল না—তাঁহার লেখায় বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটী বলিতে হয়। * * যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে

ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটী খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটী, কোন্ পদটী উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এ সকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাস কালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু, যে কথাটী না হইলে নয়, সেই কথাটী প্রয়োগ করা আছে, সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য।

"মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎর্সনা, রাজার প্রতি রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার কুহকিনী শব্দে বিন্যস্ত হইয়াছে। * * * কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বঙ্কল বেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?

"পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষা গুলি সর্ব্বত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থল বিশেষে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ান হইয়াছে। যাহা হউক, সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে

মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্ত্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে ব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

ইহা "মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য" হেমচন্দ্রের মধুসূদন-স্তুতি, না চিন্তাশীল, সুপণ্ডিত ও সুলেখক হেমচন্দ্রের নিরপেক্ষ সমালোচনা, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

মধুসূদনের সতীর্থ, যথার্থ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, "মধু আপনার বিদ্যা বুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত।" মধুসূদনের অপর এক সহপাঠী, সত্যনিষ্ঠ ও সরল-হৃদয় রাজনারায়ণ বসুও লিখিয়াছেন, "মধুর আত্মশ্লাঘা কিন্তু কিছু অধিক পরিমাণে ছিল।" আত্মশ্লাঘা দোষের নহে কিন্তু মধুসূদনের আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার সময়ে সময়ে গগনস্পর্শিনী স্পর্দ্ধার আকার ধারণ করিত। 'মেঘনাদবধে'র ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত করিয়া মধুসূদন, তাঁহার পক্ষে যতদূর বিনয় প্রদর্শন সম্ভব তাহা প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় কাব্য সম্বন্ধে

বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine."

কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি বলিয়া বিঘোষিত হইতে মধুসূদনের আপত্তি নাই!!! তবে বিনয়ের সহিত মধুসূদন বলিতেছেন, মিল্টনের সমকক্ষ হওয়া যায় না। কিন্তু মধুসূদন বলিলে কি হইবে, যাঁহারা "মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য" (এরূপ ভক্ত এখনও দুই একজন আছেন!) তাঁহারা তাঁহাকে মিল্টনের আসন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, হেমচন্দ্র মধুসূদনের এরূপ অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। তিনি ভূমিকায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন:—

"স্বর্গ, মর্ত্ত, দেব, নর, রক্ষ মধ্যে যত কিছু বীর্য্যশালী আছে সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত করা হইয়াছে, অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা

করা হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিল্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের স'হত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব? অনেকে এরূপ তুলনা করেন, তাহাতেই এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার শতযোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কিনা সন্দেহ।"

মোটের উপর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে সমস্ত দোষ সত্ত্বেও "অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।"

বলা বাহুল্য, সদ্বিদ্বান হেমচন্দ্রের এই নিরপেক্ষ সমালোচনা পাঠ করিয়া কবি মধুসূদন স্বয়ং পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে প্রিয়বন্ধু রাজনারায়ণকে এতৎসম্বন্ধে সানন্দে লিখিয়াছিলেন:—

"Meghnad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A, has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language."

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও মেঘনাদবধ কাব্যের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সেকালে 'মেঘনাদ-বধ' জনসাধারণ বা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তেমন আদৃত হয় নাই। হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ' সমালোচনায় কাব্যের যে উচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার জন্যও তাঁহাকে নিন্দার ভাগী হইতে হইয়াছিল। নিরপেক্ষ সমালোচক হেমচন্দ্র এই অনুচিত নিন্দায় ব্যথিত হইলেও, স্বীয় নির্ভীক অভিমত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সপ্তবিংশতি বৎসরপরে, প্রতিভাশালিনী মহিলাকবি কামিনী রায়ের "আলো ও ছায়া"র ভূমিকা লিখিবার সময়ে তিনি এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম ; এ স্থলেও যদি আবার তাহাই ঘটে, তবে সে সকল নিন্দাবাদেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। তৎকালে মাইকেলের পুস্তক পাঠে আমার মনে যে আনন্দ ও সুখের উদ্রেক হইয়াছিল আমি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই করিতেছি; সমালোচকের 'সিংহাসন' গ্রহণ করি নাই।"

ইদানীন্তনকালে যাঁহারা মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিয়াছেন,তাঁহারা সকলেই তৎসঙ্গে হেমচন্দ্রের ভূমিকাটিও (বোধ হয়, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ভূমিকাটি)

পাঠ করিয়াছেন এবং পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। অতএব আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই ভূমিকা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার বিস্তারের সহিত মধুসূদনের কাব্যের পাঠক ও ভক্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে এবং হেমচন্দ্রের প্রশংসা কিছুমাত্র অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

"বীরবাহু কাব্য"—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২৭১ সাল ৩১শে বৈশাখ) হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীর-বাহু কাব্য' প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণী' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থস্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

"অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি ; কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম ; কপালগুণে হয় ত যশের, নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মানুষের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে, জানিয়া

শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।"

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই বিজ্ঞাপনে প্রকটীকৃত কবির স্বভাবসিদ্ধ সরলতার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"এমন সহজ ভাষায়, সরল ভাবে আর কোন কবি যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। মানুষ চাপল্য চাপিয়া রাখে, যশোলিপ্সা লুকাইয়া ফেলে, হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে যে সেই চাপল্য ও যশোলিপ্সাই আপনার সাফাই করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতেছেন, এই সরলতাই তাঁহার প্রশংসার কথা।"

কেহ কেহ বলেন, হেমচন্দ্র মধুসূদনের শিষ্য, মধুসূদন না জন্মিলে আমরা হেমচন্দ্রকে পাইতাম না, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-সমালোচনকালেই তাঁহার আদর্শে হেমচন্দ্রের কাব্য রচনা করিতে ইচ্ছা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় যে ধীরভাবে ও সতর্কতার সহিত বিচার করিলে এ সকল সিদ্ধান্ত একান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনা

করেন। তাহার পর অন্ততঃ এক যুগের (১২ বৎসর) মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "বৃত্রসংহার, প্রথম ভাগ" প্রকাশের পূর্ব্বে হেমচন্দ্র যে সকল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। 'বৃত্রসংহারে' মধুসূদনের প্রভাব কতটুকু আছে তাহা আমরা পরে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিব। 'বৃত্রসংহারে'র পরেও হেমচন্দ্র অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও মধুসূদনের প্রভাব দেখিতে পাই না। যখন কোন কবি প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, যখন স্বকীয় প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই—তখনই তরুণ কবি সমসাময়িক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বজনপ্রিয় কবির কাব্যের আদর্শে বা অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করেন। নিজের প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার পর, নিজের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশোলাভ করিবার পর, কেহ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন না। যদি মধুসূদন যথার্থই হেমচন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, তাহা হইলে 'মেঘনাদবধ'-সমালোচনার অব্যবহিত পরে হেমচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই সেই প্রভাব অধিক মাত্রায় লক্ষিত হইত। কিন্তু হেম-

চন্দ্রের কাব্যগুলিতে "অমৃতভাষী" ভারতচন্দ্রের প্রভাব যত লক্ষিত হয়, কোন সমসাময়িক কবির প্রভাব তত দেখা যায় না। বলা বাহুল্য 'বীরবাহু কাব্যে' মধুসূদনের কোনও প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। যদি এই কাব্যে কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় হেমচন্দ্রের উপর এই সময়ে রঙ্গলালের প্রভাব লক্ষিত হইবে। রঙ্গলালের প্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক,—কারণ, 'বীরবাহু কাব্যে'র প্রকাশ কালে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'কর্ম্মদেবী' রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

'রঙ্গলাল বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি'—একথা শুনিয়া হয়ত আজিকালিকার পাঠকগণ চমকিত হইবেন। তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন, আমরা রঙ্গলালকে বাড়াই-তেছি। হয়ত মনে করিবেন, যখন মধুসূদনের 'তিলো-ত্তমা' ও 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তখনও রঙ্গলালকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমরা ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি। হয়ত মনে করিবেন, মধুসূদনের কাব্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ নাই। আমরা পাঠকগণকে আশ্বস্ত করিতেছি যে, "বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে

মলিনীকৃত,এবং কবির চক্ষে 'নিমে দত্তের' আদর্শীভূত" * মধুসূদন, চরিত্রের জন্য যতই অশ্রদ্ধেয় হউন না কেন, আমরা তাঁহার কাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ও গুণপক্ষপাতী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস যে, শিক্ষার বিস্তারের সহিত মধুসূদনের কাব্যের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু তথাপি, পুনরায় আমরা বলিব যে রঙ্গলাল সেই সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞ সমালোচকগণ বলিতে পারেন, 'রঙ্গলালকে আমরা কবিবর আখ্যা প্রদান করিতে পারি না,' 'রঙ্গলাল দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি', কিন্তু পাঠকগণকে এখন একবার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা ভাবিতে হইবে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির প্রকাশের পর এবং তাঁহার জীবিত কালেই 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের একজন পণ্ডিত সমালোচক লিখিয়াছিলেন—

"Babu Rangalal Banerjea is one of the best Bengali writers of the day; and

---

* মধুসূদন সম্বন্ধে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিকথা।

though he has written a great deal in prose, is chiefly known as a poet. And he is no mean poet. Indeed to our mind, he is perhaps *the first Bengali poet of the day.* We are aware of the claims of Mr. M. M S. Dutta, whom we remember to have been styled the "Milton of Bengal." It reminded us of the incident, when Cole·ridge, the poet and metaphysician, heard Klopstock, the author of the "Messiah", called the German Milton. Yes, a *very* German Milton,replied Coleridge. Not that we deny merit to Mr. Datta as a poet, his powers are undoubtedly great But he is such a Tartar in the field of Bengali literature, that he is bound by no laws and rules whatever, but deems himself superior to them. Such license may be allowable in superhuman geniuses like Goethe and Shakespeare ; but in a poetaster like Mr. Dutta, it is simply intolerable. Mr. Dutta is wild, irregular,eccentric ; Babu Rangalal is neat, elegant, and idiomatic. A great fault in Mr. Dutta is—and it is a very

vulgar fault—that he tries to pick out all the hardest words in the dictionary. The practice of all great poets, like Wordsworth and Tennyson, is just the opposite ; they use the most common, simple and familiar words. Mr. Dutta never writes Bengali poetry, one would suppose, without having *Amarkosh* or Wilson's Sanscrit Dictionary before him."

সুতরাং হেমচন্দ্রের বাল্য রচনায় যে রঙ্গলালের ন্যায় শক্তিশালী কবির প্রভাব বিস্তৃত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

হেমচন্দ্র কিন্তু রঙ্গলালের ন্যায় ইতিহাসের ভিত্তির উপর তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি 'বীরবাহু কাব্যে'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন :—

"উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।"

ইতিহাসের ভিত্তির উপর কাব্য রচনা না করিয়া হেমচন্দ্র বোধ হয় ভাল করেন নাই। কারণ আখ্যান-

ভাগে বা ঘটনা-সংস্থানে তরুণ গ্রন্থকার তাদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আজি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহে গৃহে রক্ষিত, এবং পাঠকগণ সকলেই বোধ হয়, 'বীরবাহু কাব্য' পাঠ করিয়াছেন। তথাপি, আর এক-বার উহার আখ্যানভাগ স্মরণ করিলে ক্ষতি কি?

নিদাঘের এক সুন্দর প্রভাতে, যখন,—

"যামিনী পোহায়ে যায়, ভূষা পরি ঊষা ধায়,
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়া সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে,
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘনগুলি থুইছে॥
সুধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ধীরি,
মধু মাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনা গুনি, তারা পুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষ ভাগে একে একে বাঁধিছে॥
তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল মুক্তা সাজা,
শ্যাম ধরাতল বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন,
তরু পরে থরে থরে ফুল মালা বাঁধিছে॥
বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর গুণ গায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।" •

তখন কান্যকুব্জের যুবরাজ গ্রন্থনায়ক বীরবাহু তদীয় পিতা মহারাজ রণবীরের নিকট গ্রীষ্ম উপবনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, এবং অনুমতি লাভ করিয়া সহধর্ম্মিণী হেমলতার নিকটে গিয়া উপবনবাসের প্রস্তাব করিলেন—

"এস প্রিয়ে দুই জনে, গিয়ে গ্রীষ্ম উপবনে,
মিথুন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা পরি, পদ্ম পাতে ছত্র করি,
দোঁহে মিলি ফুল-কুল-পরিমল লুটিব॥
স্রোতকূলে দোঁহে মেলি, করিব সলিল কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতোধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিঁচে সিঁচে,
পদ্মবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব॥
মৃণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে,
হরিণী শাবকে কোলে ধরি দোঁহে খাওয়াব।
সারসে আনিয়া ধরে, রক্তজবা মালা করে,
দুইজনে সযতনে গলদেশে পরাব॥
একদিকে কেতকিনী, একদিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব।
তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে,
ব্যাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব॥"

বলা বাহুল্য, যুবরাজ-মহিষী এই প্রস্তাবে অতিমাত্র আনন্দিতা হইলেন। উভয়ে উপবনে গিয়া আমোদ আহ্লাদে মত্ত, "হেন কালে যোগিনীর বেশে একজন, ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন।" যোগিনী পরিচয় দিলেন, তিনি এক রাজকন্যা, স্বয়ম্বর সভায় অম্বরের ভূপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া পতিগৃহে গমনকালে দুষ্ট যবনের হাতে পড়েন। যবনেরা পতিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধা করে। তিনি কৌশল করিয়া স্বীয় উদ্ধার সাধন করেন এবং নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তীর্থগুলি পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছদিগের দ্বারা কলঙ্কিত। এমন কি হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামও "ম্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে"—

"নাহি সে সোণার কাশী, পাষাণের বারাণসী,
পাষণ্ড প্লাবিত হয়ে পাপস্রোতে ভাসিছে।"

যোগিনী ওজস্বিনী ভাষায় দেশের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া, যুবরাজকে তিরস্কার করিলেন,—

"ভারতে কনোজ ধাম, প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া॥"

যোগিনীর উত্তেজনাময়ী ভাষায় যুবরাজ রোমাঞ্চিতকায় হইলেন। তখন,—

"জ্বলিল চিন্তার শিখা হৃদয় ভিতরে।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগিল অন্তরে॥
যে ভারতে দেবগণ মানব লীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয়॥
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল।
সুর-শরাঘাত জ্বালা করিত শীতল॥
যে ভারতে সৌরকুল মহাবীরগণ।
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন॥
দিলীপ সগর রঘু দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির॥
যে ভারতে বীরবৃন্দ সমর কৌশল।
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষ দল।
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল॥"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বীরবাহুর

"* * দুর্জ্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল।
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া॥

যেন গগনের দর্প, বায়ুর নিঃস্বন।
শুনি ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন॥
কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগর গর্জ্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে॥"

অনন্তর বীরবাহু অবিলম্বে পিতৃসকাশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কনোজ-পতির নিকটে কনোজ-অভিমুখী যবনসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার অনুমতি লইলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন "বীর্য্য যার, ধরা তার, বিধির নির্ণয়।"

যবনের সহিত যুদ্ধে বীরবাহু আহত ও অচেতন হইলেন এবং যুবরাজমহিষী শত্রুহস্তগতা হইলেন। যবনরাজ যুবরাজমহিষী হেমলতার ধর্ম্মনাশ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু অপর এক হিন্দুরাজকন্যা, যাঁহার সতীত্ব তিনি পূর্ব্বে অপহরণ করিয়াছিলেন, হেমলতার দুঃখে দুঃখিনী হইলেন, কারণ,

"ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার গ্রহ করে সেই,
তাদৃশ না পারে অন্য পরে।"—

এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন "দিয়াছি আমার ধর্ম্ম, তোমার রাখিব।" ইঁহার কৌশলে যবনরাজ প্রতারিত হইলেন।

হেমচন্দ্র

এদিকে বীরবাহু চেতনালাভ করিয়া অসহ্য শোকে মুহ্যমান হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপেই হউক "প্রমদার বিমোচন, যবনকুল নিধন, অদ্যাবধি এই মম পণ।" ম্লেচ্ছপদাঙ্ককলুষিত দেশের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া তিনি একস্থানে বলিতেছেন ;—

"রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার॥
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী মণ্ডিত।
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি॥
গোমুখী বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবা রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নর অংশে জন্ম সেই রামনারায়ণ।
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন॥
তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাগিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥

সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ॥
ভবভূতি তব নাম অনাশ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব অন্তরে॥
এবে সেই দেশমান্যা ভারত বক্ষেতে!
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥"

হায়! তাঁহার কত আশা ছিল—

"বিজয় দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব।"

এখন "ঘুচিল মনের সাধ জনম মতন।
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন॥"

অতঃপর বীরবাহু শ্বশুর কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে জলপথে যাত্রা করিলেন;—

"গিয়া সাগরের তীর, একত্রেতে যত বীর,
সহস্র তরণী পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল॥"

তখন,—

"কিবা শোভা দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়,
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী।"

কিন্তু ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। অকস্মাৎ—

"বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিম জলদ রেখা,
ঢাকিল রবির কর, নভোদেশ ব্যাপিল।
গর্জ্জিল জলদ জাল, যেন প্রলয়ের কাল,
সহস্র কেশরি-নাদে জলদল নাদিল॥

মাতিল তরঙ্গকুল, স্থল স্থল কুল কূল,
ডাক ছাড়ি লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয় পবন হাঁকে, স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে,
তরু লতা গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল॥
বজ্রের চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতাসের হন্ হনি,
সমুদ্র মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।
প্লাবন করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি,
অবিচ্ছেদে মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে॥
দশদিক অন্ধকার, শূন্য জল একাকার,
হুই হুই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।
চমকে চিকুর রেখা, তাহে মাঝে যায় দেখা
জলধিতরঙ্গরঙ্গ চমকিত নয়নে॥
পর্ব্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ,
স্থলুস্থলু চারিকূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।
দনুজ সহস্র জন, করি ভীম গরজন,
আকাশমণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে।
অথবা অনন্ত যেন, প্রসারি সহস্র ফণ,
তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে॥

কিম্বা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্ব্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে॥
দেব কীর্ত্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
যত তরী দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ।"

বীরবাহু কোন মতে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুঃখ কি অসীম!—

"হীনবীর্য্য হলে পরে, বুঝি বা সে শোকভরে,
উন্মাদ হইত কিম্বা আত্মহত্যা সাধিত।
মহা তেজ-ধারী বীর, তাই আছিলেন স্থির,
শালতরু রহে যেন হয়ে বজ্র দণ্ডিত॥
গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহ্যে স্বল্প শোক তার,
কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা-ফণী দংশিছে।
মেঘের সৃজন যেন, নহে চক্ষে দরশন,
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে॥"

উদাসীর ন্যায় বীরবাহু—

"যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়,
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা।"

এমন সময়ে হঠাৎ ছয়জন দেবকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা শাপগ্রস্তা বরুণ-তনয়া। কোন বিপদ

হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করায়, ইঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বীরবাহুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অলৌকিক উপায়ে যবনরাজধানীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিলেন। এইস্থানে যবনরাজকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া এবং অপর হিন্দুরাজন্যবর্গের সহায়তায় যবনকুল বিনষ্ট করিয়া বীরবাহু সহধর্ম্মিণীর উদ্ধারসাধন ও দিল্লীরাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

আমাদের বিবেচনায় এই কাব্যের আখ্যানভাগে হেমচন্দ্র তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু উপরি উদ্ধৃত পদগুলি পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, কি মনোহর প্রকৃতি বর্ণনায়, কি সুন্দর কল্পনা শক্তি প্রদর্শনে, কি করুণ রসের অবতারণায়, কি উৎকৃষ্ট ভাব সমাবেশে সকল বিষয়েই তরুণ কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে।

এই কাব্য সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন,— 'বীরবাহুকাব্যে' একদিকে যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ ভাষা ও ছন্দের উপর হেম-চন্দ্রের আধিপত্য সঞ্চার দেখা যাইতেছে।" পণ্ডিত কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতে 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

ন্যায় "এখানিও বাল্যরচনা কিন্তু ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ়, ইহাতে ভাবসন্নিবেশেরও উৎকর্ষ আছে। * * * দোষাদি সত্ত্বেও অনেক পরিণতবয়স্ক কবি এরূপ কাব্য রচনায় আপনাকে যশস্বী বোধ করিতে পারিতেন।"

হাইকোর্টে উন্নতি। সাহিত্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্র যেমন ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন, ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়েও তিনি সেইরূপ অপ্রতিহতভাবে উন্নতিলাভ করিতেছিলেন।

হাইকোর্টে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরে হেমচন্দ্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রমাপ্রসাদ রায় পরলোকগমন করেন। হাইকোর্টে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে শীঘ্র উন্নতিলাভ করা সম্ভব নহে। রমাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুর পর হেমচন্দ্র হাইকোর্টে উন্নতির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বরিশালে ওকালতি করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এই সময়ে একটি আকস্মিক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁহার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হয়। সে ঘটনাটি আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন।—

"যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন উকীলের জুনিয়রি করিতেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সুতরাং হেমবাবুকেই argue করিতে হইল। মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের বৃদ্ধি হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; আয় মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা হইতে লাগিল।"

বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হেমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাগুণে কি বিচারপতি কি সহকর্ম্মী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং প্রধান উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই হেমচন্দ্রকে ভালবাসিতেন বা শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল (ও পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) দ্বারকানাথ মিত্র হেমচন্দ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। দ্বারকানাথ তাঁহার সময়ে একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে

চিনিতে পারিতেন এবং প্রতিভার আদর করিতে জানিতেন। তিনি মনস্বী রমেশচন্দ্র মিত্র ও হেমচন্দ্রকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আজি-কালি সেরূপ ভালবাসা দেখা যায় না। হেমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র প্রায়ই দ্বারকানাথের বাটীতে যাইতেন এবং তিন বন্ধুতে নানাপ্রকার আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত "বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী"তে দ্বারকানাথ ও হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জীবনী লিখিতে হেমচন্দ্র কালীপ্রসন্নবাবুকে উপকরণাদিসংগ্রহবিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। আমরা নিম্নে উহা উদ্ধার করিলাম।—

"একবার কোন মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ ও বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায় এক পক্ষের এবং বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অপর পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলেন। অনুকূল বাবু এবং দ্বারকা-নাথের মনে বিশ্বাস জন্মে, এই মোকদ্দমায় হেমবাবু আত্মরক্ষা সমর্থনার্থ জজদিগের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহাঁরা মোকদ্দমার বিচারকালে জজদিগের নিকট

ইহার উল্লেখ করেন ও পরে বিচারগৃহের বাহিরে আসিয়া দ্বারকানাথ হেমবাবুকে বলেন, "তুই একজন লেঠেল হোবি।" বস্তুতঃ হেমবাবু কোনরূপ মিথ্যা ব্যবহার না করায় ইঁহাদিগের এই ব্যবহারে এবং দ্বারকানাথের এই কথায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হয়, তিনি উকীলদিগের লাইব্রেরী গৃহে যাইয়া, ইঁহাদিগের এই ব্যবহারের জন্য উভয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে এই ঘটনার এই স্থলেই একপ্রকার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু হেমবাবুর এই প্রতিবাদসূচক দুঃখ প্রকাশে দ্বারকানাথের মনে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হয়, তিনি সেই দিবস রাত্রি এগারটার সময় হেমবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে এইরূপ লিখিত থাকে ;—তোমার কথায় আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। তুমি যতক্ষণ না আমাকে ক্ষমা করিয়াছ বলিয়া পত্র লিখিতেছ—ততক্ষণ আমি আহার করিতে পারিব না ও রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না।"

এই সময়ের আর একটি কৌতুকাবহ গল্প হেমচন্দ্র বন্ধুবান্ধবগণের নিকট প্রায় বলিতেন। আমরা হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে সেই গল্পটি যেভাবে শুনিয়াছি, সেই ভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।*

* আশুবাবু এই গল্পটি হেমচন্দ্রের নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটও আমরা এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম।

হেমচন্দ্র

যখন হেমচন্দ্র মুন্সেফ ছিলেন, তখন তাঁহার আদালতে এক খণ্ড ভূমির দখল সাব্যস্ত লইয়া একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাদীপক্ষ ভূমিখণ্ডের দাবী করিয়া বলেন যে উক্তস্থান তাঁহারাই বহুকাল দখল করিয়া আসিতেছেন এবং উহার উপর যে চণ্ডীমণ্ডপ আছে উহাও তাঁহাদের বহুকালের সম্পত্তি। বিবাদী বলেন যে বাদীর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা—সেখানে কোন চণ্ডীমণ্ডপ নাই—ভূমি-খণ্ড বিবাদীর বহুকালের সম্পত্তি। হেমচন্দ্র ইহা অবগত হইয়া ঘটনাস্থল দেখিবার জন্য গমন করেন। বিবাদী ইতঃপূর্ব্বেই বাদীর অবর্ত্তমানে চণ্ডীমণ্ডপটী ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। হেম-চন্দ্র যখন ঘটনাস্থলে আসিলেন তখন তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। তিনি তাহা দেখিয়াই, আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না লইয়া মোক-দ্দমাটী খারিজ করিয়া দিলেন। বহুদিবস পরে হেমচন্দ্র যখন হাইকোর্টের উকীল, সেই সময়ে এই মোকদ্দমাটি আপিলের জন্য হাইকোর্টে আসে। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ মিত্র এক পক্ষে উকীল নিযুক্ত হন। ঘটনাচক্রে যেদিন দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, সেই দিন হেমচন্দ্র তাঁহার নিকট বসিয়া ছিলেন। কাগজ দেখিতে দেখিতে দ্বারকানাথ বলিলেন "হেম। মফঃস্বলের এক মুন্সেফের বুদ্ধির দৌড় দেখ।"—এই বলিয়া তিনি মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলেন "চণ্ডীমণ্ডপটী নাই দেখিয়াই একেবারে রায় প্রকাশের পূর্ব্বে মুন্সেফ টীর এই বুদ্ধিটুকু হইল না যে দুই একটি সাক্ষ্য লইয়া চণ্ডীমণ্ডপটী প্রকৃত সেখানে ছিল কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখি।" হেমচন্দ্র

বলিলেন, "মুন্সেফদের বুদ্ধি প্রায়ই ঐরূপ সূক্ষ্মই হইয়া থাকে। কোন্ শা—মুন্সেফ হে?" দ্বারকানাথ তখন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া মুন্সেফটীর নাম আবিষ্কার করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" হেমচন্দ্রেরও তখন মনে পড়িয়া গেল যে তিনিও এক সময়ে ঐরূপ একটি মোকদ্দমার তদন্তে গিয়াছিলেন। তখন তিনি হাস্যমুখে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও দ্বারিক! ও যে আমিই হে!" তখন দুই বন্ধুর হাস্যরোলে সমস্ত গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। সেদিন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার স্বীকারোক্তি করিতে এবং পরে এই গল্প সহাস্যবদনে বন্ধুবান্ধবদের মজলিসে বা আত্মীয় স্বজনের নিকট বিবৃত করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই। হেমচন্দ্রের প্রকৃতি এইরূপ সরল ও অমায়িক ছিল।

দ্বারকানাথের ন্যায় বন্ধুর সাহায্যে এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে হেমচন্দ্র শীঘ্রই হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাসিক আয় দুই সহস্র মুদ্রার কম ছিল না। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তাঁহার বেশ স্মরণ আছে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কাউয়েল যখন ভারত বর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়ে কথোপ-কথন প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ বাবু কাউয়েলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে শিক্ষাবিভাগে থাকিয়া তিনি দুইশত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেছেন, কিন্তু

তাঁহার সহপাঠী হেমচন্দ্র ওকালতীতে মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন। ইহাতে শিক্ষাব্রত কাউয়েল সান্ত্বনাচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ওকালতীতে দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন অপেক্ষা আমি শিক্ষাবিভাগে দুইশত মুদ্রা বেশী পছন্দ করি।"

হেমচন্দ্রের এই দ্রুত উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য সহপাঠীরাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের সৌভাগ্যরবি উদিত দেখিয়া তারাপ্রসাদও একবার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বলেন, তারাপ্রসাদ বাবুর মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে একটি গানের কয়েকটি পদ তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি ধ্রুব পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের নিষেবণ করেন নাই। সে গানটি অনেকেই জানেন,—

"চাষবাস করিয়া খাইত আব্‌দুল,
তখন ছ্যালো ভাল;
জাহাজের খালাসী হয়ে আব্‌দুল
দরিয়ায় ডুবে ম'ল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—o—

"নলিনী-বসন্ত," "অবোধবন্ধু" ও "ভারতে ব্রাহ্ম-ঈশ্বরবাদ।"

হাইকোর্টে 'কালো জজ'। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন দিবসে (২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ বঙ্গাব্দ) হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি সদাশয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শম্ভুনাথ অতিশয় ন্যায়পরায়ণ, সুপণ্ডিত, স্বাধীন-হৃদয় ও বহুদর্শী বিচারপতি ছিলেন। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল হেমচন্দ্র নহেন, হাইকোর্টের সমস্ত উকীল ও বিচারপতি এবং হাইকোর্টের বাহিরে সমস্ত শিক্ষিত সমাজ গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান সরকারী উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও প্রায় দুইশত সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তি শ্মশান পর্য্যন্ত শম্ভুনাথের শবদেহের অনুগমন করিয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শম্ভুনাথের মৃত্যুর পর কে বিচারপতির আসনে

অধিষ্ঠিত হইবেন তৎসম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিতে লাগিল। যেরূপ যোগ্যতার সহিত শম্ভুনাথ দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে একজন দেশীয় ভদ্রব্যক্তি যে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনজন যোগ্য ব্যক্তির নাম সকলের মনে স্বতঃই উদিত হইল। প্রধান সরকারী উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বিচক্ষণ ও ভূয়োদর্শী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিভাশালী দ্বারকানাথ মিত্র—এই তিনজনের মধ্যে একজন যে শম্ভুনাথের আসন অধিকার করিবেন ইহা সকলে এক প্রকার স্থির করিয়া লইলেন। কৃষ্ণকিশোর বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। দ্বারকানাথের বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার কথা হাইকোর্টের তাৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণ্‌স্ পিককের অবিদিত ছিল না এবং তিনিই শম্ভুনাথের আসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন। বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথের নিয়োগে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু হেমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন।



৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত

দ্বারকানাথের নিয়োগ বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র হেমচন্দ্র তাঁহার সহযোগিগণের সহিত তাঁহার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতে গেলেন। দ্বারকানাথকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাসরসিক হেমচন্দ্র তাঁহার সহযোগিগণকে বলিলেন, "দোয়ারি যে অন্ধকার কালো, ওকে জজ্ মানাবে না;" দ্বারকানাথ ইহার উত্তরে সহাস্যবদনে বলেন, "এইত ঠিক, শম্ভুনাথ বাবু সাহেবের মত ফরসা ছিলেন, তিনি সাহেব কি ভারতবর্ষীয় হঠাৎ স্থির করা যেত না। এখন কোর্টে ঢুকেই লোকে দেখবে কালো নেটিভ জজ্ আদালত অন্ধকার করে' বসে' রয়েছে, খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হবে না!"

বলা বাহুল্য, হাইকোর্টের এই 'কালো' জজের প্রতিভালোকে সমগ্র বঙ্গদেশ একদিন উজ্জ্বল হইয়াছিল, এবং তাহার পর আরও অনেক 'কালো' জজ বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালার গৌরবভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

"নলিনী-বসন্ত"। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, নব্য বাঙ্গালী সমাজে জগদ্বিখ্যাত কবি সেক্ষপিয়রের পাঠক ও ভক্তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়া-



দ্বারকানাথ মিত্র

ছিল, আর কোন বিদেশীয় কবি সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসন, হার্ম্মান জেফ্রয়, রেভারেণ্ড বেলু, জেম্স্ হিউম প্রভৃতি সেক্ষপিয়রের ভক্তগণ এদেশে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ কবির কাব্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যে ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। সেক্ষপিয়রের অমর কাব্যনিচয় সকল দেশেই প্রাপ্যসম্মান আদায় করিয়াছে। বহু ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাবলী অনূদিত হইয়া সেই সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশেও সেক্ষপিয়রের গ্রন্থাদির অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছিল। মুক্তারাম তর্ক-বাগীশ Lamb's Tales from Shakespeare অনুবাদ করিয়া সেক্ষপিয়রের কাব্যগুলির আখ্যানভাগ বঙ্গভাষায় প্রচারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস্' অবলম্বনে 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' নামক নাটক প্রণয়ন করিয়া হরচন্দ্র ঘোষই সর্ব্বপ্রথমে সেক্ষপিয়রের কাব্যসৌন্দর্য্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। ইনি পরে "রোমিও ও জুলিয়েত" অবলম্বনে "চারুমুখ-চিত্তহরা" নামক আর একখানি নাটকও প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু হরচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল ছিল না এবং গ্রন্থকার তাঁহার প্রথম পুস্তক "ভানুমতী-চিত্তবিলাসে"র

যেরূপ সমাদরপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, উহা তদনুরূপ সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই।

হেমচন্দ্র চিরদিনই সেক্ষপিয়রের কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। একাধিক কাব্যে তাঁহার এই সেক্ষপিয়র-প্রীতি প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার "ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা" শীর্ষক কবিতায় কালিদাস ও সেক্ষপিয়রের কথায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"পরে অদভূত প্রাণী দুইজন
আইল পূজিতে সারদাচরণ—
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।

ডাকিলা সারদা আনন্দে দু'জনে
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;
অমূল্য বীণাটি দিলা একজনে.
দিলা অন্য জনে নবধা রস॥

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দুজন,
একজন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া মনঃ হরে,

একজন বসি' এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর নরে ॥"

তিনি সেক্ষপিয়রের 'টেম্পেষ্ট্' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার "নলিনী-বসন্ত" প্রকাশিত হইল। (সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ)।

এই গ্রন্থের প্রকাশকালে 'কলিকাতা গেজেটে' উহার এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল:—

"পুস্তকের নাম—নলিনী-বসন্ত (Lotus and Spring) নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সেক্ষপিয়রের Tempest-এর অনুকরণে। ১৭২ নং বৌবাজার, ষ্ট্যানহোপ প্রেসে, আই, সি, বোস কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশের তারিখ—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ, ৩০০ ছাপা হইল। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।"

আজ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাকবি সেক্ষপিয়রের মূল কাব্যগুলি পঠিত হইতেছে। কিন্তু যখন ইংরাজী শিক্ষা এক্ষণকার ন্যায় বিস্তৃতিলাভ করে নাই তখন ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক আলোচ্য গ্রন্থ

পাঠে 'টেম্পেষ্টে'র রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

'টেম্পেষ্টে'র অবিকল অনুবাদ না হইলেও "নলিনী-বসন্তে" সেই জগদ্বিখ্যাত কাব্যের উচ্চভাব ও মধুর রস অতি নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি কি সুন্দর!—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

"দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারিধারে সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।"

এরিয়েলের সুপ্রসিদ্ধ সলিল-সমাধি-সঙ্গীতটির অনুবাদ অবিকল না হইলেও ভাবপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক :—

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

"কি হবে কাঁদিলে ভবে কেহ চিরজীবী নয়,
ভূপতি শকতিহীন করিতে শমন জয়।
গভীর গভীর জলে, তব পিতা দৈববলে,
সৌরভ গৌরব ভুলে, হয়ে আছে শবকায়।
অই শুন শঙ্খধ্বনি, পাতালে নাগ কামিনী,
সে দেহ তুলিয়ে আনি, অন্ত্যেষ্টি করিতে যায়॥
যোজন যোজন পথ, যাও হে ধরণীনাথ,
পূরাইতে মনোরথ, দেখিতে পাইবে তায়।"

মিরাণ্ডার (নলিনীর) নিকট ফার্দ্দিনন্দের (বসন্তের) প্রেমনিবেদন কি মধুর ভাবে হেমচন্দ্র ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

হে সুন্দরি! এ বয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পীযূষ লহরী,
শ্রবণ কুহর ভরে পিয়াসা জুড়ায়ে;
দেখেছি নিমেষ শূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী;
কিন্তু আহা নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একাধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু—তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা!

প্রাণেশ্বরি ! প্রজাপতি গঠিলা তোমায়,
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া।

*　　*　　*

চন্দ্র, সূর্য্য, বসুন্ধরা—সাক্ষী হও সবে,
সত্য যদি বলি তবে বাঞ্ছা সিদ্ধি করো,
প্রতারণা মিথ্যা যদি থাকে এ কথায়,
তবে যেন আশাতৃষ্ণা সব মিথ্যা হয়,—
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সবার উপরি,
ভালবাসি, ভক্তি করি, তোমায় সুন্দরি !"

প্রস্পেরোর (বৈজয়ন্তের) সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটিও কি সুন্দর ভাবে ভাষান্তরিত হইয়াছে :—

"লীলা হলো সমাপন।—এ রঙ্গভূমিতে
সেজেছিল যত পরি করি নট বেশ
বায়ুর পুত্তলি তারা মিশিল বায়ুতে,—
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে !
হবে লীন এইরূপে, ইহাদেরি মত,
মাটীর পুত্তলি যত মানব এ ভবে ;
পাষাণের অট্টালিকা অভ্রভেদী চূড়া,
দেউল, মন্দির, মঠ, উন্নত শরীর,
রাজ-নিকেতন কিম্বা দেব-অট্টালিকা
আভাময়ী, রত্নময়ী—চূর্ণ হয়ে যাবে !

এই যে মহীমণ্ডল ফণীন্দ্র আসনে,
পয়োধি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রাণিবৃন্দ সহ,
এও ধ্বংস হবে শেষে—চিহ্নটি না রবে!
অসার স্বপ্নের ন্যায় নিদ্রায় বেষ্টিত
অনিত্য আমরা সবে অনিত্য জগতে।"

এইগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি পদ বাঙ্গালার সুভাষিত-সংগ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য। যথা:—

"কুলাঙ্গার কুপুত্র কখন
জনমে সোণার গর্ভে?"

"অদৃষ্টই মূলাধার এ মহীমণ্ডলে।

"অনেক আমোদাহ্লাদ আছে এ সংসারে
বহুকষ্ট ব্যতিরেকে সম্ভোগ না হয়;—
কিন্তু সে কষ্টের কষ্ট আনন্দে ঘুচায়।"

"এ দুরন্ত ভূমণ্ডলে, মানব জাতিতে
ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম—পরম দুর্লভ।
অনুতাপে তাপিত যে তারে দণ্ড দেওয়া
ভ্রান্তমতি মানবের কভু বিধি নয়।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্ণমেণ্ট সেক্ষপিয়রের জন্মস্থান Stratford-on-Avonএ প্রতিষ্ঠিত সেক্ষপিয়র-স্মৃতি-পাঠাগারে সেক্ষপিয়রের কাব্যাদি অবলম্বনে রচিত যে

সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন, * তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের "নলিনী-বসন্ত"ও প্রেরিত হইয়াছিল।

"অবোধবন্ধু।" ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ "অবোধবন্ধু" নামক

---

* পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সকল গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Tempest	অবলম্বনে রচিত	নলিনী-বসন্ত ঝটিকা প্রকৃতি নাটক
Cymbeline	" "	কুসুমকুমারী নাটক সুশীলা-বীরসিংহ
Macbeth	" "	কর্ণবীর রুদ্রপাল নাটক
Merchant of Venice	"	সুরলতা নাটক
Comedy of Errors	" "	ভ্রান্তিবিলাস
Midsummer night's dream	"	শরৎশশী নাটক
Hamlet	" "	অমরসিংহ
Twelfth Night	" "	সুশীলা-চন্দ্রকেতু
Romeo & Juliet	" "	রোমিও-জুলিয়েত (উপন্যাস)
All's well that ends well	"	ভীষক দুহিতা (উপন্যাস)
Lamb's Tales	" "	সেক্ষপীয়রের গল্প (১ম ভাগ)

একটি অতি ক্ষুদ্র আকারের মাসিকপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই মাসিকপত্রখানি প্রধানতঃ বালক-বালিকা এবং অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের জন্য কল্পিত হয়। প্রথম সংখ্যায় "আরম্ভ" শীর্ষক প্রথম সন্দর্ভে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণিদেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধবন্ধু, যদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যূহের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে ; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধবন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফল লাভ করিব।"

এই মাসিকপত্রে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সুধিগণ নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। দ্বিতীয়বর্ষে এই পত্রের আকার বর্দ্ধিত হয় এবং উক্ত বর্ষের নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়া যোগেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিলে, কবিবর বিহারীলাল "অবোধবন্ধু"র সত্বাধিকারী



কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী

ও সম্পাদক হইয়া দশম সংখ্যা হইতে উক্ত পত্র পরিচালিত করেন।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল হেমচন্দ্রের সহিত বিহারীলালের আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ে উভয়ের কাব্যের অনুরাগী হইয়া পড়েন। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অধুনাবিলুপ্ত "প্রয়াস" পত্রে বিহারীলালের জীবনচরিত প্রকাশিত করিতেছিলেন, তখন তিনি বিহারীলালের জীবনী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের স্মৃতিকথা ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানিতে সমুৎসুক হন। হেমচন্দ্র তখন অন্ধ হইয়া কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণ বাবুর পত্রপ্রাপ্তি মাত্র যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিহারীলালের কাব্যের প্রতি তাঁহার আনুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা নবকৃষ্ণ বাবুর সৌজন্যে পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলাম।—

কাশীধাম
১২ই সেপ্টেম্বর ৯৯।

কল্যাণবরেষু,—

কবি ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয়

ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন বৃত্তান্ত আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। এই মাত্র বলিতে পারি যে তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, এবং তাঁহার যতগুলি কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি সকল গুলিই মধুরতাময় ও কবিত্বপূর্ণ। ইতি

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ। আপনি যে দুইখানি টিকিট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার একখানি এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাইলাম।

বিহারীলাল প্রায়ই হেমচন্দ্রকে "অবোধবন্ধু"তে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। এই অনুরোধের ফলে "ইন্দ্রের সুধাপান" রচিত হয়।

"ইন্দ্রের সুধাপান" ১২৭৬ সালে শ্রাবণ মাসের "অবোধবন্ধুতে" প্রকাশিত হয়। উহা ড্রাইডেনের Alexander's Feast নামক বিখ্যাত কবিতার অনুকরণে লিখিত। ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সুধাপান বটে, কিন্তু বিলাতী ব্রাণ্ডির মাদকতা সুধায় বুঝি বা নাই।" কিন্তু সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক "কলিকাতা রিবিউ" পত্রে বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক এক প্রস্তাবে*

* ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের "সাহিত্যে" বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক এই ইংরাজী প্রস্তাবটীর বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া হেমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"Babu Hem Chunder Banerji, though less known to fame, is a far better poet. His *Indra's Nectar Feast* is a *spirited* imitation of Dryden's *Alexander's Feast.*"

'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের অপর এক সমালোচক উক্ত সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর সমালোচন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এই কবিতাটী তাঁহার মতে কবিতাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।

হেমচন্দ্রের রচনার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে তিনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহ প্রকাশিত করিবার সময়েও একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। যখন তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রণয়ন করেন, তখনও এই সঙ্কোচের ভাব দূর হয় নাই। এ বিষয়ে মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবির প্রকৃতি হইতে তাঁহার প্রকৃতি ঠিক বিপরীত ছিল। তাঁহার সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্রের পরিহাসরসিক বন্ধুগণ প্রায়ই তাঁহার সহিত রহস্য করিতেন। কিন্তু এই রহস্য সরল-



আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

হৃদয় কবির মনে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ আঘাত করিত। আচার্য্য কৃষ্ণকমল "পুরাতন প্রসঙ্গে" বলিয়াছেন :—

"কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারী উকীল অন্নদা বাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'হেমবাবু বলেন কি জান? Other people's poetry survives them; but I shall survive my poetry.' হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেমবাবু অস্থির হইয়া উঠিতেন। Dryden's Alexander's Feast হেমবাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে আছে। ঐ যে Third Number Poetical Readerএ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী* (তিনি নিজে একজন সুকবি) বলেন,'হেমবাবুর poetry ত কেবল third number poetry দেখ্‌তে পাই।' আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।"

এই স্থলে আমরা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি অক্ষয়চন্দ্র উভয়েরই হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ

* আন্দুলের সুবিখ্যাত চৌধুরী বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি M. A. B. L. পাশ করিয়া এটর্নি হন।





৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী

ছিল। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিতা, 'শুভ-বিবাহ' রচয়িত্রী, শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী মহাশয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে অক্ষয়বাবু "কলেজের ছাত্রাবস্থায় হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও সদা সর্ব্বদা হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিতেন।"

পিতৃবিয়োগ। "ভারতে ব্রাহ্ম-ঈশ্বরবাদ।"

দরিদ্র হেমচন্দ্র স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে যখন সমাজে ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর সম্মান ও সুখলাভের আশায় সমুৎফুল্ল, তখন অতর্কিত-ভাবে এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থ্য পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিলেন। পিতৃভক্ত হেমচন্দ্রের কোমল ও স্নেহপূর্ণ হৃদয় এই আকস্মিক বিপদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কিছুকাল কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিলেন। গয়ায় তাঁহার পিতৃদেবের তর্পণাদি করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন।

কেশবচন্দ্র এই সময়ে দেশময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া

এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিও যে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় "কুসংস্কার" পরিত্যাগ না করিয়া গয়ায় পিতৃতর্পণ করিলেন, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চ:শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া "কুসংস্কারপূর্ণ" হিন্দু আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, এরূপ ইঙ্গিতও করিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র Brahmo Theism in India শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রস্তাব রচনা করেন এবং উহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া, কি জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই প্রস্তাবটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পুস্তকের নাম—Brahmo Theism in India (ভারতে ব্রাহ্ম-ঈশ্বরবাদ) ইংরাজী ভাষায় লিখিত, শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বিষয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম মানুষের প্রয়োজনীয়তার

পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং ভারতবর্ষে (উহা) প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই (Brahmoism inadequate to the wants of man and not likely to be prevalent in India)। ২৪৯ নং বৌবাজার রোড, ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসে আই, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ৭ই এপ্রিল ১৮৬৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ, ১৫০ ছাপা হইল। গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।"

পুস্তকের মূল্য নির্দ্দিষ্ট নাই এবং প্রচারসংখ্যাও অল্প। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে পুস্তিকাখানি বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থ মুদ্রিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থের সমালোচনা করা আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, হেমচন্দ্র এই প্রবন্ধে যে গভীর চিন্তা-শীলতা, সতর্ক বিচারশক্তি, আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা ও সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তার্কিকগণের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'এডুকেশন গেজেট'—'ভারত-বিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত'।

"এডুকেশন গেজেট।" মনীষি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং দক্ষিণ বাঙ্গালার বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক সিবিলিয়ান মিষ্টার হজ্‌সন্‌ প্র্যাটের চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই দিবসে "এডুকেশন গেজেট" পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই পত্র প্রচারকল্পে অর্থ সাহায্য করিতেন। উহাতে তখন কেবল সংবাদ ও বিজ্ঞাপন মাত্র প্রকাশিত হইত, কোনও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত না। পরে গবর্ণ-মেণ্টের নীতি যথাযথভাবে বর্ণন বা সমর্থন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বী একটি সংবাদ পত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এডুকেশন গেজেট' এইরূপ সংবাদ পত্রে পরিণত হয়। গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকের বেতন স্বরূপ তিনশত টাকা মাসিক সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। রেভারেণ্ড ডব্লিউ, ওব্রায়েন স্মিথ এই

পত্রের সম্পাদক এবং কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল এই পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে "বাঙ্গালার আর্ণল্ড" শিক্ষককুল-তিলক প্যারীচরণ সরকার এই পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সম্পাদকতাকালে এ পত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত স্বাধীনচেতা প্যারীচরণের কোন নির্ভীক প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর হয় এবং প্যারীচরণ নিজ সম্মান রক্ষার জন্য সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। * অতঃপর (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) মনীষি ভূদেব মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন।

হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের সহিত ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় জামাতা, হাইকোর্টের অন্যতম উকীল, উত্তরপাড়া নিবাসী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। বামাচরণ বাবু উত্তরপাড়া হিতকরী সভার

---

* যাঁহারা বিস্তারিতভাবে এই বিবরণ জানিতে সমুৎসুক, তাঁহাদিগকে আমরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ, মহাশয়ের "প্যারীচরণ সরকার" নামক জীবনবৃত্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সম্পাদক এবং অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। ইনি হেমচন্দ্রের কাব্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বামাচরণ বাবুর ভ্রাতা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে হেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে উত্তরপাড়ায় বামাচরণ বাবুর নিকট যাইতেন, তাঁহার নূতন অপ্রকাশিত কবিতাদি পাঠ করিতেন এবং নানাবিধ সাহিত্যালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। বামাচরণ বাবুর সহিত হেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ার বাটীতে আসিয়া সেই ঋষিকল্প মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ভূদেব বাবুর পুত্র মুকুন্দদেব বাবু বলেন যে হেমচন্দ্র যখনই আসিতেন তখনই "ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা অনেক হইত।" সেই

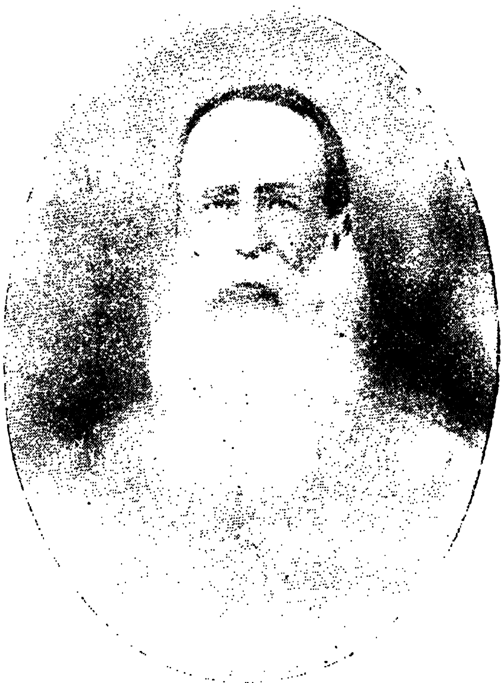
"আয়ত-লোচন উন্নত ললাট
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট"—

মাধবাচার্য্য-সদৃশ তেজস্বী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ভূদেবের নিকট হেমচন্দ্র যে উপদেশ ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন, তাহা নিরর্থক হয় নাই। ভূদেবের নিকট হেমচন্দ্র যে "দীক্ষা" পাইয়াছিলেন, মনে হয়, প্রধানতঃ তাহারই ফলে

তিনি সেই অপূর্ব্ব ভাব-সাম্রাজ্য সংগঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যে সাম্রাজ্যের শক্তি প্রতিকূল প্রভাবে কখনও প্রতিহত হইবে না, যে সাম্রাজ্যের গৌরব সর্ব্বজয়ী কালের প্রভাবে কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না।

ভূদেব বাবু 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করিবার পর প্রথম কতিপয় সংখ্যায় কোন কবিতা প্রকাশিত করেন নাই। ১২৭৫ সালের ১৭ই মাঘ সম্পাদক লিখিলেন "এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা সুলেখক-গণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে।" সেই দিনই হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ" শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহার পর নিয়মিতভাবে হেমচন্দ্রের কবিতা 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমরা নিম্নে সেই কবিতাগুলির নাম ও প্রকাশের তারিখ উদ্ধৃত করিয়া, পরে সেই কবিতাগুলি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

(১)	হতাশের আক্ষেপ	১৭ই মাঘ	১২৭৫
(২)	জীবন সঙ্গীত	২রা ফাল্গুন	"
(৩)	বিধবা	১৬ই "	"
(৪)	যমুনা-তটে	২৮শে চৈত্র	"
(৫)	কোন একটি পাখীর প্রতি	২৬শে বৈশাখ	১২৭৬



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

(৬)	লজ্জাবতী	১৬ই শ্রাবণ	১২৭৬
(৭)	মদন পারিজাত	২৭শে চৈত্র	"
		ও ৩রা বৈশাখ	১২৭৭
(৮)	জীবন-মরীচিকা	৩০শে বৈশাখ	"
(৯)	ভারত-বিলাপ	২৮শে জ্যৈষ্ঠ	"
(১০)	প্রিয়তমার প্রতি	২৫শে আষাঢ়	"
(১১)	ভারত-সঙ্গীত	৭ই শ্রাবণ	"
(১২)	গঙ্গার উৎপত্তি	৫ই কার্ত্তিক	"
(১৩)	ভরতপক্ষীর প্রতি	২৬শে "	"
(১৪)	পদ্মের মৃণাল	৬ই ফাল্গুন	"
(১৫)	প্রলয়	১০ই আষাঢ়	১২৭৮
(১৬)	উন্মাদিনী	৬ই শ্রাবণ	"
(১৭)	অশোক-তরু	১০ই ভাদ্র	"
(১৮)	কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ	২৪শে "	"
(১৯)	ভারত-কামিনী	৩১শে "	"
(২০)	কাল-চক্র	২৬শে ফাল্গুন	"

(১) "হতাশের আক্ষেপ" (৫) "কোন একটি পাখীর প্রতি" ও (১০) "প্রিয়তমার প্রতি।"—এই কবিতাগুলি "প্রেমের কবিতা"র পর্য্যায়ভুক্ত। হেমচন্দ্রের "প্রেমের কবিতা" অধিক নাই। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন, গীতি-কবিতাকাররূপে হেমচন্দ্রের

প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল "as one crossed in hopeless love." তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্ম উচ্চতর মহত্তর সঙ্গীত গাহিবার নিমিত্ত এবং অনতিকাল মধ্যে "উচ্চতানে বঙ্গ-প্রাণে মিশাইয়া প্রাণ", উদ্দীপনার তরঙ্গ তুলিয়া, "নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি" স্রোতেতে ডুবাইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হউক না কেন, প্রেম-গীতির দুর্ভিক্ষ কখনও হয় নাই—হইবে বলিয়াও মনে হয় না। প্রেমসঙ্গীতের সুর চিরপুরাতন হইলেও হেমচন্দ্রের এই নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলিতে তাঁহার এক বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তাঁহার সরল ও মধুর পদাবলী পাঠ করিলে প্রাণে এক নূতন বিষাদের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। কবিতাগুলির যে কোনও স্থান পাঠ করুন,—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে.
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!"

"ভুলিব ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি,
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন ,
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন ?"

"প্রেয়সীরে অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ?
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে,
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ুর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে !
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে ক'রে রাখিছে !
হের প্রিয়ে পুনরায়. পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিত প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখরে জলদ-কাছে পুনরায় ছুটিছে ;
প্রেয়সী রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।"

—তাঁহার বিশেষত্ব উপলব্ধ হইবে, পূর্ব্বগামিগণ হইতে তাঁহার পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। 'আর্য্য দর্শনে'র একজন সমালোচক যথার্থই ব'লিয়াছিলেন—

"হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' প্রণয়সম্ভূত কবিতা বটে

কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির আভাস পর্য্যন্ত নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্যের পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। এই প্রেম সম্পূর্ণ মানসিকী।"

কাব্য-বিশারদ কালীপ্রসন্নের মতে—

"তাঁহার রুচি মার্জ্জিত, প্রণয়ের চিত্র পঙ্কিলতা-বর্জ্জিত, 'জ্যোছনা ফুলের ছড়াছড়িতে' অন্তঃসারশূন্য বাক্যবিন্যাস হেমচন্দ্রের ছিল না। তাঁহার সরল প্রাণের সরল কথা সরল ভাব ব্যক্ত করিত। যে ভাবুক সে কথার আড়ম্বর ভুলিয়া ভাবের গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া বিরহ-ব্যাকুল হইলে চিরদিনই বলিবে,—

'দেখ প্রিয়ে সূর্য্য আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
স্বর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধ'রে নভশ্চর ফিরিল॥
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল॥'

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"প্রেমের কবিতায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্গীয় কবিগণের 'অশিক্ষিতপটুতা' ও সিদ্ধি সর্ব্বজনসম্মত। হেমচন্দ্রের নিরাশপ্রেমের কবিতাগুলি বঙ্গীয় বালক ও বধূগণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রোদয় দেখিলেই 'আবার গগনে



রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন

কেন সুধাংশু উদয় হে' অনেকে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদপেক্ষাও গভীর প্রেমের বিলাপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়। তাহা প্রাণের গুপ্ত তন্ত্রীর তার স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া ফেলে।"

উৎকৃষ্ট কবিদিগের রচনার গুণ এই যে কাল্পনিক বস্তুও অনেক সময়ে বাস্তবের ন্যায় পাঠকের মানস নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। হেমচন্দ্রের এই নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে উহা কবির জীবনের কোন প্রকৃত ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট। বিশেষতঃ, তাঁহার 'হতাশের আক্ষেপ' শীর্ষক কবিতার কোন কোন অংশ,—যথা, "কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি!" "হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক প্রায়, ধাইতে অমৃত আশে বুকে বজ্র বাজিল,"—পাঠ করিয়া অনেকের এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কারণ হেমচন্দ্রের এক শ্যালিকার নাম ছিল প্রমদা। ইনি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী অশিক্ষিতা ও স্বল্পবুদ্ধি ছিলেন, সেই জন্য হেমচন্দ্র অবিমিশ্র পারিবারিক সুখলাভে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রমদা দেবীর নিকট যাইতেন এবং নানা প্রকার সদালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

তিনি বন্ধুবর্গের নিকট তাঁহার শ্যালিকার বিবিধ গুণ-গ্রামের প্রশংসাও করিতেন। কিন্তু আমরা অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি যে উক্ত নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি যে হেমচন্দ্রের জীবনের ঘটনামূলক এ ধারণা একান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতৎসম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

"হতাশের আক্ষেপ' কবিতাটী যে Autobiographical এ বিশ্বাস আজ কেন বহুদিনই আছে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হেমবাবু তাঁহার শ্যালীকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচনা করেন। তাঁহার শ্যালীর নাম ছিল প্রমদা—সেই জন্য এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছিল। হেমবাবু শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী রমণীর বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। অতি সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে যে অবস্থা হওয়া সম্ভব হেমবাবুর জীবন তাহার এক জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমার সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কথা কহিতে-ছিলেন। * * * ক্রমে আমার শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীর কথা আসিয়া পড়িল। তিনি তাঁহার অন্যান্য গুণের প্রশংসা করিয়া শিক্ষা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 'ও কি মানুষ না জন্তু'। Intelligent মেয়ে মানুষ দেখিতে চাও, আমার শ্যালীকে দেখ। তাঁর সঙ্গে এক দণ্ড কথা কহিলে কত সুখী হইতে পারিবে।

যে বিষয়ে কথা কও তিনি সেই বিষয়ে কথা কহিতে পারেন। সমস্ত current topics এর সংবাদ রাখেন। বাঙ্গালা কাগজ রীতিমত পড়েন, আর সামান্য ঘটনা হইতে এখন যে Burma War হইতেছে তাহার তিনি সংবাদ রাখেন। আমি তাঁকে বড় admire করি, আর সেই জন্য লোকে আমার অখ্যাতি পর্য্যন্ত করে।'

আমি প্রমদা দেবীকে একবারমাত্র দেখিয়াছিলাম। সেই আমি প্রথম হেমবাবুর সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী দুর্গোৎসব দেখিতে যাই। She was absolutely wanting in charms, but struck me as a polished and cultured woman in her own way. তখন তিনি বহুদিন বিধবা হইয়াছিলেন।

পরে আমি যতদূর (আমার অবস্থায়) সম্ভব অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম যে এ অখ্যাতির কোনও ভিত্তি ছিল না। তাঁহার শ্যালকেরা হেমবাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন; এরূপ একটা কলঙ্ক রটনা থাকিলে এরূপ ব্যবহার সম্ভব বোধ হয় না।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন এ অখ্যাতি একান্ত অমূলক। প্রমদাদেবী বয়সে হেমবাবু অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন এবং দেখিতে সুশ্রী ছিলেন না।

কেহ কেহ বলেন হেমচন্দ্রের আত্মজীবনমূলক না

হইলেও "হতাশের আক্ষেপ" তাঁহার কোন বন্ধুর জীবনের এক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অসম্ভব নহে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" নামক গ্রন্থে এরূপ বিলাতী পরকীয়া প্রেমের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন এই আত্ম-জীবনী পাঠ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছিলেন :—

"আরও জানা গেল, হেমবাবুর 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে'—শুধু বাঙ্গালা কাব্যে ইংরাজি নিরাশ প্রেমের নকল নহে। এই 'নকল' শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালার ঘরে অভিনয় করিতেন; বিবাহিতা বিদ্যুতের মুখে নবীনবাবু যে কথার আরোপ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয়, ঘরের তুলসীর চারা তুলিয়া ফেলিয়া তিনি বিলাতী আইভি লতা রোপণ করিতে চাহিয়াছিলেন।"

'প্রিয়তমার প্রতি' শীর্ষক কবিতাটী কেহ কেহ কবিবরের প্রিয় সুহৃৎ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর বিয়োগস্মৃতিজনিত রচনা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা এক্ষণে নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। 'বঙ্কিম-জীবনী' পাঠে প্রতীত হয় যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা সহধর্ম্মিণী স্বর্গারোহণ করেন। আলোচ্য কবিতাটি

তাহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়।

(২) "জীবন-সঙ্গীত।" ইহা লংফেলোর জগৎ-প্রসিদ্ধ কবিতা 'The Psalm of Life'এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ।

"বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন।"

"সংসার সমরাঙ্গণে, যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।"

"সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্ ;
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।

সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে,
আমরাও হব হে অমর ;
সেই পথ লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে ;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।"

—এ সকল মহাবাণী হেমচন্দ্রের প্রসাদে বাঙ্গালী মাতৃভাষায় শুনিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

(৩) "বিধবা।" হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী নৃত্যকালীর চরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে আমরা এই সুন্দর কবিতাটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। পরে ঐ কবিতাটী সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

(৪) "যমুনাতটে।"—পিতৃবিয়োগের পর প্রবাসে যমুনা-তটে শোক সন্তপ্ত কবির কোমল হৃদয়ে প্রকৃতিদেবী কি মধুর সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়াছিলেন!—

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে।

হু হু করে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি।
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে!
না জানি মানব মন হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।"

(৬) "লজ্জাবতী।"—এই কবিতাটীর idea কোথা হইতে কবি পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৭) "মদন পারিজাত।"—ইহা ইংরাজ কবি পোপের Eloisa to Abelard নামক কবিতার অনুকরণে রচিত ইহাতে পরিণয় সংস্কারের যে নিন্দা ও স্বাধীন প্রেমের যে প্রশংসা আছে তাহা বাঙ্গালী সমাজের আদর্শের পরিপন্থী হইলেও প্রতীচ্য কাব্যের ভাবানুবাদের হিসাবে সুন্দর:—

"হাতে সূতো বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়?
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।

স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয় !
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ ,
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।
ভূমণ্ডল-পতি যদি চরণে আমার
ধরে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তার,
তুচ্ছ করে দূরে ফেলি ; মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হয়ে থাকি তার ঘরে !
যে রমণী সে সৌভাগ্য ভুঞ্জে চিরকাল
কত ভাগ্যবতী সেই, হায় রে কপাল !
কিবা সুধাময় সেই সুখের সময়,
সুখের সাগর যেন উচ্ছ্বাসিত হয়।
পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ডরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে।
আশার থাকে না ক্ষোভ, ভাষার যোজনা
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা।
সেই সুখ —সুখ যদি থাকে মহীতলে—
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে !"

(৮) "জীবন মরীচিকা।" ইহার প্রথম কয়েক পংক্তিতে হেমচন্দ্র মানবের জীবন-সমস্যার কথা তুলিয়াছেন।—

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ, ধরিয়া অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়া বাজী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গ দল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত নব আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপূত,
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময়, মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুখময়, সংসারে।
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুম গন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল, সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্তবিকারে।

সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত, এইরূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে!"

একজন চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী লেখক বলেন যে, যে MyEstery of xistence বা জীবন-সমস্যার আলোচনা মনীষী কার্লাইলের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের কর্ত্তব্য, সেই সমস্যার অবতারণা ও মীমাংসা হেমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে কেহই করিতে প্রয়াস পান নাই, হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিবর হেমচন্দ্রের হৃদয় আধুনিক যুগের এই জীবন-সমস্যার আবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হেমচন্দ্রের প্রথম বয়সের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' হইতে তাঁহার শেষ বয়সের 'দশমহাবিদ্যা' পর্য্যন্ত ইহার পরিচয়স্থল। এতদ্ভিন্ন বহুতর খণ্ডকবিতাতেও ইহার বিকাশ দেখিতে

পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার 'জীবন-মরীচিকা', 'গঙ্গার উৎপত্তি' উল্লিখিত হইতে পারে।" আমরা যথা-স্থানে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

(৯) এবং (১১) ভারত বিলাপ ও ভারত সঙ্গীত। এই দুইটী কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। এই দুইটী কবিতা রচনা করিয়া হেমচন্দ্র একেবারে বাঙ্গালার প্রথম শ্রেণীর কবির আসন প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি বলিয়া তাঁহার যশঃ পরিব্যাপ্ত হয়। আমরা পরে এই কবিতাদ্বয়ের বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিব।

(১২) গঙ্গার উৎপত্তি। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক রাজনারায়ণ বসু বলেন, "আমার মতে হেমচন্দ্র বাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং সনাতন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"ঋষি কয়জন সন্ধ্যা সমাপন
করি' এক দিন বসিলা ধ্যানে,
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে।

'রাখ ঋষিগণ—সমূলে নিধন
মানব সংসার হ'ল এবার,
হ'ল ছারখার ভুবন আমার,
অনাবৃষ্টি-তাপ সহেনা আর।'

শুনে ঋষিগণ করি দৃঢ় পণ
যোগে দিলা মন একান্ত-চিতে,
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

মানব-মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময়;
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগন-মণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর নাহি কোন স্বর
অবনী অম্বর স্তম্ভিত-প্রায়
নিবিড় আঁধার জলধি হুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

নাহি করে গতি গ্রহদল-পতি
অবনী-মণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদ-নদী-জল হইল অচল
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয়,
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবন ত্রয়।

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়—
ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

হায় কি অপার আনন্দ আমার
ব্রহ্ম সনাতন-চরণ হ'তে
ব্রহ্ম কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমান পথে।"

(১৩) ভরতপক্ষীর প্রতি। ইহা জগদ্বিখ্যাত কবি শেলীর To a Sky-lark শীর্ষক প্রসিদ্ধ গীতি কবিতার সুললিত ভাবানুবাদ। পূজনীয় শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যখন হেমচন্দ্রের এই কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহা পাঠ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "ইংরাজী কবিতার অমন সুন্দর বাঙ্গালায় অনুবাদ তাহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।"

(১৪) পদ্মের মৃণাল। সরোবরে একটি পদ্মের মৃণাল দেখিয়া কবির মনে "সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি।" তাঁহার মনে হইল—"সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি? অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি?" মিসর, গ্রীস্, রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতনের কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বপ্রেমিক কবি অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন।

(১৫) প্রলয়।—"১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতিরেখা নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, প্রায় অর্দ্ধেক

পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এবং যেরূপ বেগে আসিতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করাই সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত হইয়াছিল।" কিন্তু বিধাতা যে তাঁহার সৃষ্টি এরূপে নাশ করিবেন, কবির দৃষ্টিতে তাহা অসম্ভব বোধ হইতেছে :—

"এত যে সহস্র জীবের রতন—
দেবের সদৃশ মহামতিগণ
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানব জাতিতে
আনন্দ নির্ঝর অজস্র করিতে,—
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে ?

তবে কি কারণ, বৃথা এ সকল
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল
এমন তপন, তারা, শশধর
এত সুখ দুঃখ, রূপ মনোহর—
বিধির সৃজন কেন, কি ভাবে ?

নাহি কি কোনই অভিসন্ধি তার ?
জীবাত্মা জীবন সকলি অসার
এত যে যাতনা, যাতনাই সার—
সুধুই বিধির সাধের খেলা !"

(১৬) উন্মাদিনী।—'হতাশের আক্ষেপ' শীর্ষক কবিতার পরিচয়প্রসঙ্গে আমরা 'আর্য্যদর্শনে'র একজন সুবিজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হেমচন্দ্রের প্রণয়গীতিতে কুত্রাপি ইন্দ্রিয়াসক্তির আভাস নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি এই কবিতাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"উন্মাদিনী" দেখ—রমণী প্রেম-নৈরাশ্যে উন্মাদিনী। ইহাতে কেমন গাম্ভীর্য্য, কেমন মাধুর্য্য, কেমন মাহাত্ম্য, প্রেমের কেমন উচ্চ আদর্শ ও ইন্দ্রিয়াসক্তিবিহীনতা, রমণীদের হৃদয়ের কেমন মহিমা কীর্ত্তন।"

(১৭) অশোকতরু।—ইহাতে কবির নিজস্ব বিষাদের সুর অপূর্ব্বভাবে ঝঙ্কৃত হইয়াছে:—

"তরু রে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ, সুখ হারা।
জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসেনা তাহারা?

এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায় কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।

এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী তীরে।

(১৮) কুলীনকন্যাগণের আক্ষেপ।—"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।"

যাঁহাদিগের প্রতি "বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা, বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর"—সেই কুলীন মহিলাগণের দুঃখে কবির সহিত কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন?

"সাতশত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী ভিতরে,
এইরূপে অহরহ অশ্রুধারা ঝরে
* * * * ।

কত রাজ্য হলো গেলো, কত ইন্দ্রপাত,
নক্ষত্র খসিল কত, ভূধর নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারতভূমে, হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন।"

(১৯) ভারতকামিনী।—ইহার প্রারম্ভে হিন্দু বালবিধবা ও কুলীন মহিলাগণের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় পরদুঃখকাতর কবি, আচারসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণহৃদয় হিন্দু ভ্রাতৃগণকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন :—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !"

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন,—

"এডুকেশন গেজেটে এ সকল কিছুই ছিল না। এখন কুলাঙ্গার শব্দ ৩।৪ বার আছে, তখন একবারও ছিল না। ইহাতে বুঝা যায়, ভূদেব বাবু যে কেবল সমীচীন সম্পাদক এমন নহেন, প্রত্যুত তাঁহার স্বজাতিভক্তি আক্রোশ বা আড়ম্বরের সামগ্রী নহে, হৃদয়ের সহজ অবস্থা।"

'এডুকেশন গেজেটে' "অরে কুলাঙ্গার" ইত্যাদি নাই,—ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে সমীচীন সম্পাদক ভূদেব হেমচন্দ্রের রচনা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের নিকট কেহ কিছু পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে তিনি সানন্দে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তাঁহার আত্মশ্লাঘা বড় কম ছিল; বিশেষতঃ ভূদেবের প্রতি হেমচন্দ্রের আজীবন যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে মনে হয় যে, যদি ভূদেব স্বয়ং উক্ত পংক্তি কয়টী পরিবর্জ্জন করিয়া দিতেন তাহা হইলে হেমচন্দ্র কখনই উহা পুনর্মুদ্রিত করিতেন না। হেমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার রচনা বারম্বার সংশোধন করিতেন, এবং মনে হয়, তিনি স্বয়ংই দেশবাসীর ঔদাসিন্য দূর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কবিতাটির পুনর্মুদ্রণকালে এইরূপ তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই অবস্থায় লিখিয়াছিলেন—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্ত দিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিয়াছিস্! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ

করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষা-গুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। * * * হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।"

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক রায়সাহেব দীনেশ চন্দ্র সেন হেমচন্দ্রের "অরে দুরাচার" প্রভৃতি পদগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"হিন্দু সমাজকে কোন পাদ্রীও বোধ হয় ইহা হইতে অধিক গালি দেন নাই। অথচ এই কণ্ঠধ্বনির তীব্রত্বে হলাহল নাই, অমৃত আছে; উহা ভালবাসার কটূক্তি। এই সরল

ও নির্ভীক উক্তির জন্ত আমরা কবিকে শ্রদ্ধা করি। সমাজকে এইভাবে তিরস্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তায় লোকেরাই করিতে পারেন। কবি এ স্থলে সমাজের ভিষক ও প্রাণদাতা।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহার ন্তায় স্বজাতিপ্রেম ও দেশবাৎসল্য হেমচন্দ্রের নাই। "থাকিলে, 'কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার' লিখিতে তাঁহার লেখনী কাঁপিত, বলিতে তাঁহার জিহ্বা জড়াইয়া যাইত। ঐরূপ লেখা যদি স্বজাতি প্রেম হয়, তবে স্বজাতি বিদ্বেষ কাহাকে বলে, তাহা জানি না।" অক্ষয়চন্দ্র তদ্বিরচিত 'কবি হেমচন্দ্র' শীর্ষক গ্রন্থে এইরূপ অনেকগুলি অদ্ভুত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা পরে যথাস্থানে সেগুলির বিচার করিব এবং তৎসঙ্গে হেমচন্দ্রের স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশ বাৎসল্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। "কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার" লিখিতে হেমচন্দ্রের লেখনী যে কাঁপে নাই তাহা কে বলিল? সন্তানের মঙ্গল কামনায় যখন জননী তাহাকে শাসন করেন, তাহাকে ভর্ৎসনা

করেন, তাহাকে প্রহার করেন, তখন জননীর হৃদয়ের ভিতরে কি হয় তাহা কে জানিতে পারে? বাৎসল্যের প্রতিমা যশোদারাণীর পক্ষেও তাঁহার জীবনের একমাত্র স্নেহাধার প্রাণাধিক গোপালের মঙ্গলের জন্য স্বীয় হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া কঠোর শাসনে প্রবৃত্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যেখানে প্রেম অতি গভীর, সেখানে প্রেমাস্পদের প্রতি জোরও অধিক। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ একটী সঙ্গীতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন "এবার কালী তোমায় খাব।" ইহা দেখিয়াই হয় ত কোন সমালোচক বলিতে পারেন, "কি ভয়ানক! রামপ্রসাদ একজন অসভ্য নরমাংসভোজী ছিলেন!" রামপ্রসাদ জগজ্জননীকে "বাপ তুলিয়া"ও গালি দিতে ছাড়েন নাই, সুতরাং তিনি যে একজন অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, সেই সমালোচক বোধ হয়, নিঃসঙ্কোচে এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইবেন! আমরা পাঠকগণকে এই কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা,—
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে।

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক হৃদয় ছুটিত সমরে,—
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা, আনন্দে ভাসিয়া,
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।

কোথা সে এখন অসি-ভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোবারা নারী,
অরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে,
পতি, পিতা, সুত, সংহতি লয়ে?

বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা কিরণে জগৎ ভাতিল—
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ?
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে!

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয়-নিনাদে বসুন্ধরা ভরা?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহস বিভাস,
সে সব রমণী কোথা রে এবে?

সে দিন গিয়াছে, পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম;
নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার,
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
　　পিশাচের হেয় হয়েছে সবে!

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার?
কেন তবে আজও ভারত ভিতরে
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বালমীকি? বারিধারা ঝরে
　　সীতা-দময়ন্তী, সাবিত্রী রবে?

গভীর নিনাদে করিয়া ঝঙ্কার
বাজ্‌রে বীণা বাজ্‌ একবার
　　ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।

*　　*　　*

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার?
পেয়ে নিজ মান, পরি নিজ বেশ
জ্ঞান দম্ভ তেজে পুরে নিজ দেশ।
　　বীর বংশাবলী প্রসূতি হবে?

এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে,
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,—
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড—
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?

চৈতন্য, গৌতম, নাহি কি রে আর,
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?—
ঋষি বিশ্বামিত্র রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব,—
ভারত যদি না উন্নত হবে ?

ধিক্ হিন্দুজাতি হয়ে আর্য্য বংশ,
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস !
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে।"

ইহা পাঠ করিলে কি মনে হয় যে যিনি জাতির ও দেশের অতীতগৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগকে কুৎসিত আচার সমূহ পরিবর্জ্জনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, তিনি দেশবিদ্বেষী ও সমাজ

বিদ্বেষী ? যে সকল সমালোচক হেমচন্দ্রের স্থায় কবিকে স্বদেশ-বিদ্বেষী ও স্বজাতি-বিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদিগের স্বজাতিপ্রেম ও দেশবাৎসল্য সম্বন্ধে বোধ হয় দ্বিমত থাকিতে পারে না।

(২০) কালচক্র।—সকল জাতিই "আনন্দ উৎসাহ মনে, নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া" চলিয়াছে। কবি পূর্ব্বগৌরব-বিস্মৃত হিন্দুজাতিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া বলিতেছেন :—

তবুও বারেক ফিরে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি!
শোভে কি নক্ষত্র ভাতি
উন্নত গগনপরে ধরাতল ভাতিয়া?
ছিল সাধ বড় মনে
ভারত (ও) ওদেরই সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;
আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া!
জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর ;
একজন (ও) কাঁদে নারে পূর্ব্ব কথা ভাবিয়া।
এ ক্ষিতি-মণ্ডল-মাঝ
আর্য্য কি রে নাহি আজ
শুনায়ে সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।
সে সাধ ঘুচেছে হায়,
আয় মা জননী আয়,
ল'য়ে তোর মৃতকায়,
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

ভারত-বিলাপ ও ভারত-সঙ্গীত।

আমরা এ পর্য্যন্ত এই দুইটি দেশবিশ্রুত অতুলনীয় কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। এক্ষণে এই দুইটি কবিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব।

"এডুকেশন গেজেটে" 'ভারতবিলাপ' 'ভারতসঙ্গীতে'র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও, 'ভারতসঙ্গীত'ই প্রথমে রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। রচনার পূর্ব্বে কয়েকদিন ধরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ লক্ষ্য করিলেন, হেমচন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ এবং অন্যমনস্ক। বিষাদের কারণ কি? তাহা

কেহই জানিতে পারিলেন না। বাহিরে প্রকৃতিদেবীর অবস্থাও হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অনুরূপ। কয়দিন ধরিয়া আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, বায়ু বহিতেছে না, চারিদিক যেন স্তব্ধ। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশ হইতে বারিধারা পতিত হইয়া ধরাতল সুস্নিগ্ধ করিল। হেমচন্দ্রের বিষাদের ভাবও অকস্মাৎ বিদূরিত হইল, তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি কাগজ পেন্সিল লইয়া এক বৈঠকে সমগ্র 'ভারত সঙ্গীত'টী লিখিয়া ফেলিলেন।

'এডুকেশন গেজেটে' 'ভারত বিলাপ' ও 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা পুণ্যস্মৃতি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের "ভূদেব চরিতে"র পাণ্ডুলিপি * হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"হেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে (তাঁহার প্রিয়বন্ধু এবং ভূদেব বাবুর জামাতা) ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চুচুড়ার বাড়ীতে আসিয়া ভূদেব বাবুর সহিত দেখা করিতেন। ভারতের

* সম্প্রতি 'ভুদেব চরিত প্রথম ভাগ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব গৌরবের কথা অনেকই হইত। হেমবাবু স্বদেশ ভক্তিতে পরিষিক্ত হইয়া ভূদেব বাবুরই বিশেষ প্রীতির জন্য 'ভারত সঙ্গীত'টী লিখিয়া পাঠাইলে ভূদেব বাবু বলিয়া পাঠান "জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা"— বাক্যটা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উল্লেখ করে, উহা ঠিক নয়। বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে নরম সুরই সঙ্গত। তাহাতে হেমবাবু 'ভারত-বিলাপ' লিখিয়া পাঠান। উহাতে ভূদেব বাবুর উপরোক্ত পরামর্শের এবং পূর্ব্বের লিখিত অপ্রকাশিত "ভারত সঙ্গীতে"র প্রতি লক্ষ্য আছে,—

'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার।'

সেটি (১০ই জুন ১৮৭০) প্রকাশিত হইল! কিন্তু ভারত সঙ্গীতের ন্যায় অতুল্য স্বদেশভক্তির উদ্দীপক কবিতাটী প্রকাশ না করায় দেশের ক্ষতি এই বিবেচনায় ভূদেব বাবু উহাকে ঐতিহাসিক চিত্রে পরিবর্ত্তিত করাইয়া দেন। এডুকেশন গেজেটে যখন উহা প্রকাশিত হইল তখন উহাতে "শিবজী নয়নে হানিয়া বিজলী" ছিল এবং "সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট" অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল।" * * *

"সে যাহা হউক ১৮৭০ অব্দের ২২শে জুলাইয়ের এডুকেশন গেজেটে 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টার রবিন্‌সন সাহেব এক বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন। তিনি 'যবন' শব্দের অনুবাদ করিলেন 'বৈদেশিক' (foreigner)

এবং মহারাষ্ট্রীয় 'শিবজী'কে ঐতিহাসিক ভাববর্জ্জিত করিয়া 'শিউজী' বানান করিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে উভয় কবিতার জন্য কৈফিয়ত তলব হইল। ভূদেব বাবু ভারত বিলাপ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "উহার বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলা যাইতে পারে যে ইহ জন্মের ভাল ভাল জিনিষের অংশ ইংরাজেরাই অধিক এবং এ দেশীয়েরা কম পাইয়া থাকেন—লেখকের ইহাতে দুঃখ প্রকাশ আছে। ভারত সঙ্গীত সম্বন্ধে দেখাইলেন যে উহা ঐতিহাসিক চিত্র এবং যবন শব্দে বৈদেশিক বুঝায় না ; আওনীয় ইয়ুনানী বা গ্রীক বুঝাইত ; কিন্তু এখন মুসলমানকেই বুঝায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন—

যবন হইতে ভাল ফিরিঙ্গির মত
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত।

এখানে যবনে এবং ফিরিঙ্গী বা ফ্রাঙ্ক বা ইউরোপীয়তে স্পষ্টই প্রভেদ করা হইয়াছে। শিউজী'র এবং 'বৈদেশিকে'র জন্য রবিন্‌সন সাহেব একটু তিরস্কার খাইয়া ব্যাপারটা শেষ হইল।"

এডুকেশন গেজেটে 'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হইলে দেশময় এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। একজন শ্রদ্ধেয়া লেখিকা লিখিয়াছেন—

"যেদিন এডুকেশন গেজেটে তাঁহার ভারতসঙ্গীত প্রথম প্রকাশিত হয়, সে একদিন গিয়াছে। ভূমিকম্পে যেমন দেশের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি নড়িয়া টলমল করিতে থাকে, গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি, হেমচন্দ্রের এই এক কবিতায় সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। এমন চক্ষু ছিল না, যাহা এই কবিতা পড়িয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করে নাই, এমন হৃদয় ছিল না, যাহা ইহার আবেগে আলোড়িত, কম্পিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই। বলিতে কি, এই এক কবিতাতেই হেমচন্দ্র সাহিত্য-জগতে তাঁহার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক তাহাই। এই দুইটি কবিতা রচনা করিয়াই হেমচন্দ্র বাঙ্গালার জাতীয় কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'আর্য্যদর্শনে'র একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন :—

"যদিও হেমবাবু নানা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া স্বকীয় নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেই বঙ্গবাসীদিগের তাঁহার "ভারতসঙ্গীত" ও "ভারতবিলাপের" কথা মনে পড়ে—যেমন Grey একমাত্র Elegy written in a country church-yard লিখিলেই চিরস্মরণীয় হইতেন—যেমন Wolfe Burial of Sir John Moore—লিখিলেই কবি বলিয়া পরিগণিত হইতেন, যেমন Pope একমাত্র Eloisa to Abelard লিখিলেই কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন যেমন সেক্ষপীয়র একমাত্র Hamlet লিখিলেই তাঁহার অলৌকিক কবিত্ব জগতে প্রকাশিত

হইত,তেমনি হেমচন্দ্র যদি মাত্র "ভারতবিলাপ" বা "ভারতসঙ্গীত" লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি একজন অসাধারণ কবি বলিয়া কবিগণের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইতেন সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা বাঙ্গালাভাষাকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, যাঁহাদিগের সংস্কার ছিল বঙ্গভাষাতে হৃদয়-ভেদী ও জ্বালাময়ী কবিতা লেখা যাইতে পারে না, তাঁহাদের হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" ও "ভারতবিলাপ" পড়িয়া সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। কোন জাতির মধ্যে, কোন ভাষাতে, কোন কালে, কোন পুস্তকে এই দুই কবিতার অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বিনী কবিতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। * * * এই দুই কবিতার সহিত নবীন বাবুর কোন কবিতারই তুলনা হয় না। নবীন বাবু † কেন, বাঙ্গালা দেশের কোন কবির গ্রন্থে ঈদৃশ কবিতা লক্ষিত হয় না। ইহা একক, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অননুকরণ-সাধ্য।"

---

† কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তদ্বিরচিত "আমার জীবন" নামক গ্রন্থে এই লেখকের মুণ্ডপাত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন "আমি এডুকেশন গেজেটে" লিখিবার পূর্ব্বে স্মরণ হয় স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর "ভারতসঙ্গীত" আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতাপ্রকাশের পর প্রকাশিত হয়। * * * বোধ হয় শিশির বাবু গদ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি। চত্বারিংশ বৎসর পরে

'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পরে বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক স্বদেশ-বৎসল রাজনারায়ণ বসু তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশপ্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।

হেমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছিলেন—

"হেমচন্দ্রের ন্যায় যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি জাতি বিশেষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, জাতীয় জীবনে তাঁহারা উদ্দী-পনার স্রোত প্রবাহিত করাইয়া যান। তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেও, তাঁহাদের মরকণ্ঠ এ জগতে নীরব হইলেও, সে

সেই স্বদেশ প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর ধারা কলনাদিনী ভাগীরথীরূপে কর্জ্জন ঐরাবতকে উড়াইয়া ছুটিয়াছে।" কবিবর আপনার জয়-ঢাক আপনি বাজাইয়াছেন বোধ হয় ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। আমরা কেবল কবিবরের সুদূরপ্রসারিণী কল্পনা এবং বাস্তব বিষয়ে বিতৃষ্ণার এই প্রকৃষ্ট উদাহরণটি পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমাদিগের প্রিয় পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।



শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল

উদ্দীপনার ঝঙ্কার কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত থাকে। নদীগর্ভে প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিবে। প্রতিভা-শালী লোকের ঝঙ্কার তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া জাতিকে উদ্বোধিত করে। হেমচন্দ্রের কবিতার দুইটি চরণ যাহা কোন সুদূর বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত এই পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল তাহা প্রাণে প্রাণে জাগ্রত রহিয়া আমার হৃদয়ে কত সময় কত নব বলের কত নবীন আশার সঞ্চার করিয়া দিতেছে।

বাস্তবিকই, হেমচন্দ্রের শিঙ্গা জাতীয় জীবনে যে উদ্দীপনার বিদ্যুৎ তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও!"

প্রভৃতি পদগুলি হৃদয়কে অভূতপূর্ব্বভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলে। কৈশোরে, যখন অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, স্বপ্নও সত্য হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তখন এই কবিতা দুইটীর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তখন এই কবিতা-

দ্বয় পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আলোড়িত হইয়াছিল। তাহার পর, কতবার এই কবিতাদ্বয় পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না। যতবার পড়িয়াছি ততবারই হৃদয়ে তড়িৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে। পরিণত বয়সে,আজি যতবার এই অপূর্ব্ব প্রাণো-ন্মাদিনী সঙ্গীতটী পাঠ করিতেছি, ততবারই আমাদিগের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে আলোড়িত হইতেছে। আমাদের পক্ষে এই কবিতাদ্বয়ের বিশ্লেষণ বা সমা-লোচনা সম্ভবপর নহে। 'ভারতসঙ্গীত' রচিত হইবার বহু বৎসর পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'ভারতের জয়' শীর্ষক বিখ্যাত স্বদেশসঙ্গীত রচনা করিলে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া প্রার্থনা করি যে, অনন্ত-কাল ধরিয়া

"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারত-বাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o—

'কবিতাবলী' ও 'বঙ্গদর্শন'। অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা।

কবিতাবলী (প্রথম ভাগ)। যখন 'এডুকেশন গেজেটে' হেমচন্দ্রের গীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হইতেছিল, তখন বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায় অসীম আগ্রহ সহকারে উহা পাঠ করিতেছিলেন। শুনিয়াছি, যাঁহারা এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক বা পাঠক ছিলেন না, তাঁহারাও হেমচন্দ্রের কবিতা অন্যের নিকট হইতে নকল করাইয়া আনিয়া পাঠ করিতেন, কণ্ঠস্থ করিতেন। 'ভারত-বিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশিত হইবার পর হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহার খণ্ড কবিতাগুলি সংগৃহীত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভূদেববাবুর দ্বিতীয় জামাতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের কাব্যাদির অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে 'কবিতাবলী' প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশ

কালে 'কলিকাতা গেজেটে' নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয় :—

"পুস্তকের নাম—'কবিতাবলী' বা Sonnets. বিষয়—বিবিধ বিষয়ক Sonnets, টীকা ও টিপ্পনী সহ, 'এডুকেশন গেজেট' ও 'অবোধ বন্ধু' হইতে পুনর্মুদ্রিত। ২৪নং বৌবাজার রোডে ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসে আই, সি, বোস কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও উত্তরপাড়া হইতে বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ২১শে নবেম্বর ১৮৭০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ ডিমাই অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ ৫০০ ছাপা হইল। মূল্য ।৶০ আনা। গ্রন্থ-সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।"

বামাচরণ বাবুর ভ্রাতা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'কবিতাবলী' প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

"The first edition of কবিতাবলী was issued by my brother. The poems were first contributed to the Education Gazette, the first of them being হতাশের আক্ষেপ। My brother collected them in a scrap book and I remember that one day Hem Babu read them

to some friends at our house at Uttarpara after breakfast."

শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার বলেন যে বামাচরণ বাবুর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। হেমচন্দ্রের সমস্ত কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। 'কবিতাবলী' প্রকাশকালে মুদ্রাকরের অসাবধানতাবশতঃ পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। মুদ্রাকর ভীতচিত্তে যখন বামাচরণ বাবুর নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করে তখন হেমচন্দ্র বামাচরণবাবুর নিকটে বসিয়া ছিলেন। বামাচরণ বাবু একবার মাত্র হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এই অংশটি স্মরণ আছে কি?"—পরে হেমচন্দ্রের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বামাচরণ বাবু স্বয়ং সমস্ত অংশ মুখস্থ বলিয়া গেলেন।

আমরা অনেক অনুসন্ধানেও কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আরও অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নিশ্চয়ই ইহা সংগ্রহযোগ্য মনে করিবেন না! উহাতে কি কি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ঠিক জানিতে পারি নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৩রা নভেম্বর বামাচরণ বাবু কবিতাবলী বা Garland of



বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

poetry দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাহাও আমরা দেখিতে পাই নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই ৺উমাকালী মুখোপাধ্যায় 'কবিতাবলী বা A Collection of poems' (revised) তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তৃতীয় সংস্করণে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় :—

১। ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা * ২। দেবনিদ্রা * ৩। লজ্জাবতী লতা ৪। পরশমণি * ৫। ভারত-বিলাপ + ৬। বিধবা রমণী ৭। জীবন-সঙ্গীত ৮। পদ্মের মৃণাল + ৯। গঙ্গার উৎপত্তি ১০। প্রলয় + ১১। ভারত-কামিনী + ১২। অশোক-তরু + ১৩। যমুনাতটে ১৪। হতাশের আক্ষেপ ১৫। ইন্দ্রের সুধাপান ১৬। কোন একটি পাখীর প্রতি ১৭। প্রিয়-তমার প্রতি ১৮। চাতক পক্ষীর প্রতি ১৯। কুলীন মহিলা-বিলাপ + ২০। কমল বিলাসী * ২১। ভারতভিক্ষা * ২২। উন্মাদিনী + ২৩। মদন-পারিজাত ২৪। জীবন মরীচিকা ২৫। অন্নদার শিবপূজা * ২৬। ভারতে কালের ভেরী * ২৭। এই কি আমার সেই জীবন-তোষিণী * ২৮। দুর্গোৎসব* ২৯। স্বর্গারোহণ * ৩০। সুহৃৎ-সমাগম * ৩১। কামিনী-কুসুম। * ৩২। কালচক্র *

সূচীপত্রে লিখিত আছে যে "* চিহ্নিত কবিতা কয়েকটী নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।" অবশিষ্ট কবিতা-

গুলির মধ্যে + চিহ্নিত কবিতাগুলি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর কবিতাবলী প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর এড়ুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এগুলিও প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অচিহ্নিত কবিতাগুলি প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে উপরি-উদ্ধৃত তালিকায় সুপ্রসিদ্ধ 'ভারত-সঙ্গীত'টি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে 'ভারত-সঙ্গীত'টি কি কবিতাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল না?

পুরাতন 'বঙ্গদর্শনে' 'পশুপতি-সম্বাদ'-লেখক (চন্দ্রনাথ বসু?) ভারত-উদ্ধার-প্রয়াসী পশুপতি বাবুর 'হতভাগ্য বাঙ্গালা-সাহিত্য'-বিষয়ক যে বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :—

"দেখুন, সভ্য মহাশয়গণ, আগত শনিবার আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে একমতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, সেই সকল গ্রন্থ অতি অপকৃষ্ট এবং অপদার্থ, যেহেতু তাহাতে উদ্ধারের কথা নাই এবং উদ্ধারের প্রতিকূলে অনেক উজ্জ্বল উদাহরণ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আজ আমি বলিতে চাই যে বঙ্গে, মূর্খ, মেধাবতী মেষপালগণ ে. হেমচন্দ্রকে কবিবর বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন, সে

হেমচন্দ্র কবিবর নন, তিনি কপিবর (করতালি এবং হাস্য)। দেখিবেন, মহাশূয়গণ, আপনারা গূঢ় বিচক্ষণ করিয়া দেখিবেন যে, হেমবাবুর পুস্তকেও উদ্ধারের কথা নাই। বঙ্কিমবাবুর ন্যায় হেমবাবুও উদ্ধারবিনাশী। হেমবাবুর ন্যায় ভয়ানক, ভীষণ, ভীরু, ভূষণ্ডি ভূভারতে ভ্রমেও ভ্রূণহত্যা করিতে ভয় করে নাই। বলিতে লজ্জা হয়, যাঁহাকে আমরা বঙ্গের কপিবর বলিয়া আস্ফালন করি তিনি কি ভীরু, কি কাপুরুষ। (Shame ! Shame ! এবং মুষ্ট্যাস্ফালন) তিনি তাঁহার প্রথমভাগ কবিতাবলীতে একটি অতি সঙ্গতময়, সাহসময়, সন্তূয় সমুত্থান কবিতা ছাপাইয়াছিলেন। আহা ! সেই ভারতসঙ্গীত নামক সমুন্নত কবিতায় তিনি ভারত মাতার উদ্ধারের জন্য কত কান্নাই কাঁদিয়াছিলেন। (সকলের ক্রন্দন।) কিন্তু হায়, সে কবিতা এখন কোথায় ? বলি, স্বয়ং হেমবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে কবিতা এখন কোথায় ? তিনি কি দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত, দুর্ম্মতি, দুরভিসন্ধি, দুর্ব্বল সাহেবের ভয়ে তাহা চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন নাই ? চুরি করিয়া না রাখিলে হেমবাবুর দ্বিতীয় সংস্কারে তাহা দেখিতে পাই না কেন ? আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, হেমবাবু চোর (Hear, hear)। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি হেমবাবু চোর। (সকলে সমস্বরে—হেমবাবু চোর, হেমবাবু চোর)। তারপর হেমবাবু আর উদ্ধারের কথা মুখেও আনেন নাই। বরং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একবার উদ্ধার করিয়া আবার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। সভ্য মহিষগণ, হেমবাবুর সেই বৃত্রসংহার স্মরণ করুন। ইন্দ্রের অন্তঃপুর অব-

রুদ্ধা, সন্তাপিতা, শোচনীয়া শচী যদি বা সেই ভীষণ অন্তঃপুররূপ কারাগার হইতে পলাইয়া অরুচির মুখে একটুকু আধটুকু চাটনি দিবার উপায় করিলেন, অমনি উদ্ধারবিনাশী হেমবাবু আসিয়া তাঁহাকে আবার সেই imprisonment করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টাই করিলেন। কেন, সে শোচনীয় সতী হেমবাবুর কি করিয়াছিল যে তাহার উপর তাঁহার এত রাগ? আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে সে হেমবাবুর কুৎসিত, কদর্য্য, করুণাময় অনুরোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া সেই বালবিধবা শচীর উপর তাঁহার এত রাগ। এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তারা Byronএর ন্যায় আপনাদের গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। (একজন সভ্যকে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া) কেন, আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন না? তবে আরো অকাট্য প্রমাণ দিতেছি শুনুন। হেমবাবু সম্প্রতি দশমহাবিদ্যা নামক যে একখানি কাব্য ছাপাইয়াছেন, তাহা কি? আপনারা কি জানেন না যে, সেই কাব্যে তিনি দশজন বারবিলাসিনীর কথা লিখিয়াছেন? লিখিয়া পাঠকের চোখে ধুলা দিবার জন্য বেদান্ত সংহিতার অবিদ্যা শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি না? কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে এমনি বোকা মনে করিয়াছেন, যে অবিদ্যা শব্দের যে একটা বারবিলাসিনী অর্থ আছে তাহা আমরা জানি না? হায়! কি কুসংস্কার! কি স্পর্দ্ধা! তা সভ্যমনুষ্যগণ বিবেচনা করুন, হেমবাবু এত বারবিলাসিনীর কথা কেমন করিয়া জানিলেন?

অবশ্যই তাঁহার বারবিলাসিনীর সহিত কুৎসিত, কদর্য্য—আর না, সভ্য মহাশয়গণ, আর না, আর বলিতে পারি না, কে যেন পেটের ভিতর থেকে আমার জিব টানিয়া ধরিতেছে, O it is the আঁকুশি of my pure virtuousness! অতএব আর না। তবে এইমাত্র বলিব যে বারবিলাসিনীর সহিত আমরাও আলাপ করিয়া থাকি; শুধু আলাপ কেন, প্রণয়ও করিয়া থাকি, এবং সুবিধা দেখিলে তাহাদের সহিত ঘরকন্নাও করি। কিন্তু আমাদের কথা এক, হেমবাবুর কথা আর। আমরা বারবিলাসিনীদিগকে উদ্ধার করিব বলিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় করি। হেমবাবু কি জন্য তাহাদের সহিত প্রণয় করেন? তিনি উদ্ধারের যত প্রয়াসী, তাহা ত দেখাই গিয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম যে, এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। সভ্য মহাশয়গণ এখন অবশ্যই বোধগম্য করিয়াছেন যে হেমবাবু একজন উদ্ধার-বিনাশী, গণিকাবিলাসী, গর্হিত, গর্দ্দভ, গোবেচারা মানুষ (Hear hear, এবং বারম্বার করতালি।)

আমরা পশুপতিবাবুর অনর্গল বক্তৃতার প্রবল প্রবাহে অনেকদূর ভাসিয়া আসিয়াছি, আশা করি পাঠকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সে যাহা হউক, উপরিধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে 'কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে 'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে উহা পরিবর্জ্জিত

হয়। 'অবোধ বন্ধু' ও 'এডুকেশন গেজেটে' (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর দিবসের পূর্ব্বে) যতগুলি কবিতা হেমচন্দ্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সকল্ গুলিই প্রথম সংস্করণ 'কবিতাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

অতুলনীয় 'ভারত-সঙ্গীত'টি কেন হেমচন্দ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত করেন নাই, তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। হেমবাবুর পরম স্নেহভাজন বন্ধু উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তিনি শুনিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট এই কবিতা প্রকাশের জন্য হেমচন্দ্রকে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং প্রথম সংস্করণের বিক্রয়াবশিষ্ট গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেন, সেইজন্য ২য় ও ৩য় সংস্করণে উহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু সমসাময়িক সংবাদ পত্রাদি হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাই নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে তিনি অবশ্যই তাহা জানিতে পারিতেন। হেমচন্দ্রের অন্য কোন বন্ধুর নিকটেও আমরা এ বিষয়ে কিছু শুনি নাই। আমাদের মনে হয়, 'ভারত-সঙ্গীত' 'এডুকেশন গেজেটে' ও

'কবিতাবলীর' প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন বলিয়া, হেমচন্দ্র উক্ত কবিতাটির প্রচার গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত বুঝিয়া উহা পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে পরিবর্জ্জিত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সদাশয় লর্ড রিপণের শাসনকালে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদত্ত হইবার পর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে ৺যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করেন তাহাতে 'ভারত-সঙ্গীত' বর্ত্তমান মুখবন্ধের সহিত প্রকাশিত হয় এবং তদবধি সকল সংস্করণেই পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

'কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে আমরা তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সুধী সমালোচকবৃন্দ মুক্তকণ্ঠে এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'কলিকাতা রিভিউ' বলিয়াছিলেন :—

These poetical pieces are amongst the best specimens of Bengali poetry we have recently seen. The versification is nearly faultless, the

sentiments are not always common-place, and the imagery shows good taste in the writer. The volume is a reprint of pieces which appeared first in the columns of the "Education Gazette" and the "Abodha Bandhu". The first piece, a ballad entitled "Indra's Potation" is in our opinion the best.

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"Babu Hem Chandra is a pleader of the High Court, Calcutta, and continues to favour us with his touching, melodious and spirited effusions. A fine sensibility, a quick sportive imagination, and an exquisite sense of the beautiful, as well as chasteness of thought and grandeur of conception mark his poetry. Some of his smaller poems breathe a lofty spirit and intense feeling, his celebrated and admirable lines on India are an instance in point."

ইহার একটি কথাও অমূলক বা অতিরঞ্জিত নহে। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু যথার্থই বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সঙ্গীত আছে,—যে মধুরতা আছে, তাহা অবর্ণনীয়। এমন কি, তেমন মাধুর্য্য মাই-কেলেও নাই।"

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' দাশুরায় প্রভৃতি কবির গানের ন্যায় জনসাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই। উহা উচ্চতর সমাজের জন্য—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য —রচিত। সেই জন্য প্রথম সংস্করণে ৫০০ খণ্ড মাত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। কিন্তু শীঘ্র উহা নিঃশেষিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণে ১০০০ খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হয় এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণে ১৫০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। পরে বহুবার এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হই-য়াছে এবং হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীরও বিভিন্ন সংস্করণে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলে, হেমচন্দ্রের 'কবিতা-বলী' পড়েন নাই, এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে নাই বলিলেও চলে।

'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয়

বৎসর। এই বৎসরেই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-বিশ্রুত 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সময়ে তাঁহার 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' (নবপর্য্যায়) প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। শম্ভুচন্দ্র বঙ্কিম-চন্দ্রকে তাঁহার মাসিকপত্রের লেখকশ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করিলে বহরমপুর হইতে ১৪ই মার্চ্চ ১৮৭২ তারিখ সম্বলিত এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে উত্তর প্রদান করেন তাহাতে "বঙ্গদর্শন" প্রচারের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular, and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This I think is not exactly what it ought to be. I think that we ought "to disanglicise" ourselves, so to speak, to a



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand. I therefore project a Bengali Magazine

১২৭৯ সালে বৈশাখে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় পত্র স্থচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-প্রচারের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

"সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে, যে সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া থাকে। * *

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই, বাঙ্গালীর অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। * * এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন, যে এরূপ বার্ত্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। * *

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।

* * * * * *

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

বলা বাহুল্য, 'বঙ্গদর্শনে'র উদ্দেশ্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকামী হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। যে সকল প্রতিভাশালী লেখক প্রথম হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সদনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেমচন্দ্র সর্ব্বাগ্রগণ্য।

'বঙ্গদর্শনে'র বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত লেখকগণের নাম প্রচারিত হয় :—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জগদীশনাথ রায়
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
" রামদাস সেন
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ইঁহাদিগের মধ্যে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন যে তিনি বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন বলিয়া তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনও 'বঙ্গদর্শনে' একটিও প্রবন্ধ লিখেন নাই। দীনবন্ধু 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের দেড় বৎসরের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন এবং মনে হয় প্রথম বর্ষে আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রভাত' শীর্ষক একটি কবিতা এবং কার্ত্তিক সংখ্যায় "যমালয়ে, জীয়ন্ত মানুষ" শীর্ষক উপন্যাস ব্যতীত আর কোন প্রস্তাব লিখেন নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে একমাত্র হেমচন্দ্রই

বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়মিত ভাবে রচনাদি প্রেরণ করিয়া প্রথম হইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য লেখকগণ পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও তখন বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব্বনামা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবর্ণাক্ষরে লিখিত সন্দর্ভ সমূহের মধ্যে হেমচন্দ্রের হীরকের ন্যায় সমুজ্জল গীতিকবিতাবলী 'বঙ্গদর্শন'কে সামান্য দীপ্তি প্রদান করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র উভয়ের অলৌকিক প্রতিভা-কিরণে বাঙ্গালার গভীর অন্ধকার অকস্মাৎ অপসারিত হইল, 'বঙ্গদর্শন' অসাধ্য সাধন করিল। তখন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

"কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রচনাদি।—

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন চারি বৎসর কাল নিয়মিতভাবে (?) প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' হেমচন্দ্রের যে সকল রচনাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।—

১।	কামিনী কুসুম (কবিতা)		বঙ্গদর্শন,—	বৈশাখ ১২৭৯
২।	মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয় (প্রবন্ধ)		"	জ্যৈষ্ঠ "
৩।	দেবনিদ্রা (অসম্পূর্ণ কবিতা)		"	ভাদ্র "
৪।	ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা (কবিতা)		"	পৌষ "
৫।	পরশমণি	"	"	মাঘ "
৬।	অন্নদার শিবপূজা	"	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ ১২৮০
৭।	(মধুসূদনের) স্বর্গারোহণ		"	ভাদ্র "
৮।	দুর্গোৎসব (কবিতা)		"	আশ্বিন "
৯।	ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার (কবিতা)		"	চৈত্র "
১০।	কমল বিলাসী (কবিতা)		"	আষাঢ় ১২৮১
১১।	এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী (কবিতা)		"	আশ্বিন "
১২।	সুহৃৎ-সঙ্গম (কবিতা)		"	অগ্রহায়ণ ১২৮২

যদিও আমরা সাধারণতঃ কালক্রমানুসারে হেমচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা

করিব, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত এই রচনাগুলির পরিচয় একস্থানে লিপিবদ্ধ করা বিধেয় বলিয়া মনে হয়। আমরা সর্ব্বাগ্রে হেমচন্দ্রের গদ্য প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া, পরে তাঁহার কবিতাগুলি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

'মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়?'

হেমচন্দ্র এই প্রবন্ধে বলেন, "পৃথিবীর যে সকল জাতি মহৎ হইয়াছে, কিম্বা এখনও যাহারা মহৎ হইতেছে, তাহাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই প্রায় একটী সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য করিতে কৃতসঙ্কল্প ও সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তদর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই সে নিয়ম।" প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, "মহানুভবতা এবং উৎকর্ষপ্রিয়তাই গ্রীক্‌দিগের অপূর্ব্ব উন্নতির প্রধান কারণ। কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, যখন যাহাতে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখনি তাহারা তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে।" প্রাচীন রোমকদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া হেমচন্দ্র দেখাই-

য়াছেন যে, "বাহুবল গৌরব ও অর্জ্জনস্পৃহা" হইতে তাহাদের মহত্ত্বের উদয় হয়। "বীরত্ব, সাহস ও রাজনীতিকুশলতায়, কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান, কোন জাতিকেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের মধ্যে রোমনগরী অদ্বিতীয় হইবে, রোমনগর-বাসীর নাম, আর ক্ষিতিনাথের নাম, অভিন্ন হইবে, লাটিন জাতির বাহুবল ও পরাক্রমে ধরাতল শঙ্কিত হইবে ইহাই উহাদিগের মহাসঙ্কল্প ছিল।" আরবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, "আরবেরা প্রভূত ধর্ম্মানুরাগ হইতেই মহত্ত্ব লাভ করে।" ইংলণ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া হেমচন্দ্র বলেন, "অর্জ্জন-স্পৃহার প্রাধান্য হইতেই এই দেশের মহত্ত্ব হইয়াছে।" ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"প্রাচীন ভারত নিবাসীরা যে কিরূপ উন্নত, প্রতিভান্বিত এবং সমৃদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরাই সেই প্রতিষ্ঠিত আর্য্যবংশের ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে হেয়, অপকৃষ্ট, অপদার্থ, অক্ষম এবং অসার হইয়াছি। তথাপি সেই শ্রেষ্ঠ জগন্মান্য মহামতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলে, এখনও হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখনও সেই মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি ও গৌরব ভাবিয়া, অনেক সময়ে তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষ

দিগের মহত্ত্বের কারণ কি, তাহা আমরা কতবার অনুসন্ধান করিয়া থাকি? ইদানী ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা, এবং তাহাদিগকে এদেশ উৎসন্ন করিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের কীর্ত্তিতে ভারত নাম এখনও ভূমণ্ডলে সজীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না। ভারতের পুরাবৃত্ত নাই; কিন্তু যৎসামান্য যাহা আছে, নিবিষ্ট চিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মণেরাই সেই মহত্ত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর হইয়া তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সংসারের বিলাসবাসনা সমাজের অন্যান্যজনগণকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ এবং বিদ্যার উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, বনে বনে দারুণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেন! জ্ঞানের আলোক কিসে পৃথিবীতে দিন দিন সমধিক উজ্জ্বল হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধ্যান, চিন্তা এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অনুপম অধ্যবসায় এবং জিতেন্দ্রিয়তা গুণে তাঁহারা অভিলষিত বিষয়েও অপরিসীম মহত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য ও দর্শন এখনও পৃথিবীর পণ্ডিতকুলের বিস্ময়জনক হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তৎকালীন সমাজবন্ধনের একমাত্র দৃঢ় সূত্র ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত পূজ্য শাস্ত্রকলাপকে রক্ষণ করিবার জন্য জীবনসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অনুভব করিত।

এস্থলে আমাদিগের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে মাতৃভূমি-স্নেহ এবং বাহুবল গৌরব প্রভৃতি অন্যান্য প্রবৃত্তি তৎকালে সমাজমণ্ডলীকে সংস্পর্শ করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রবৃত্তির প্রাধান্যে তৎকালের জন-সমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিত, আমাদিগের বিবেচনায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তাহার মূল হেতু এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারত বাসিদিগের মহত্ত্বের অদ্বিতীয় কারণ। কালধর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা মতিচ্ছন্ন হইবার পর, এদেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রবৃত্তিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ত্ব হউক না কেন, তাহার হ্রাস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে। কিসে যে সেই হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। কিন্তু কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিলে সমাজের যে উন্নতি হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

আমরা এই সুলিখিত সন্দর্ভটি হইতে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমবর্ষের 'বঙ্গদর্শন' এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, সেইজন্য এই সন্দর্ভটির উপসংহার ভাগ হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, আশা করি, পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না :—

"পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ভারতবাসী আর কখন মহৎ হইতে

পারিবে না। ইহা কতদূর সত্য তাহার নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। একবার একজাতির উন্নতি হইয়া গেলে, সেই জাতি আবার সৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তিনিই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাহা না হইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে একবার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্ব্বার সমবেত হইলে, আবার মহৎ হইতে পারে। পরন্তু বর্ত্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমক দিগের কীর্ত্তিমন্দির যে ইতালীদেশ, তাহা বহু-কালাবধি হতশ্রী এবং হীনাবস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি পুনরায় সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করায়, পুনরায় সেই দেশ প্রতিভান্বিত হইয়া, জনসমাজে গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুত্থানের পক্ষে অনেক প্রতি-বন্ধক আছে সত্য, ইহা বহুবিস্তৃত দেশ এবং ইহার মধ্যে অনেক জাতি, অনেক ভাষা এবং অনেক ধর্ম্ম প্রবল আছে। তথাপি সম্যক উপযোগী একটি প্রবৃত্তি সকলের মনকে আকর্ষণ করিলে, এই সমস্ত লোক যে এক সঙ্কল্পে ব্রতী হইতে পারে না, আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন একটী জাতি যে পুনরুত্থিত হইয়া, সমুদায় ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন না, তাহার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীস অঞ্চলও এইরূপ বহুসংখ্যক নগরীতে পরিপূর্ণ ছিল; তথাপি আথিনীয়েরা গ্রীক নামের সার্থকতার নিমিত্তে কি না করিয়াছে। ভারতভূমির এক্ষণকার

এই সকল বিবিধ জাতির মধ্যে কোন্ জাতির যে পুনর্ব্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই প্রকৃতিবিধানে স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক ;—কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।"

১। কামিনী-কুসুম।—এই কবিতাটি বঙ্গের কামিনী-কুসুমের ন্যায়ই মাধুরী ও সুধারসে পরিপূর্ণ,—

"এ মাধুরী সুধারস পাব কোথা কুসুমে,
এমন কোথায় আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে দেখিতে ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে।"

বঙ্গের কামিনী-কুসুমের মাধুরী, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার এরূপ সসম্ভ্রম সমাদর আর কোন কবি করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কবিতাটীর সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার জন্য কোন অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যে কোন স্থান পাঠ করিলেই উহা উপলব্ধ হইবে। হেমচন্দ্র সকল রচনাই বারম্বার সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতেন। 'বঙ্গদর্শনে'

প্রকাশিত সকল কবিতাই পরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। দেবনিদ্রা—এ কবিতাটী অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশিত হয়—কখনও সম্পূর্ণ করা হয় নাই। ইহাতে 'ভারতসঙ্গীতে'র সেই ওজস্বিতা, সেই উদ্দীপনা, অননুকরণীয় ভাষায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

৪। ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি গ্রে'র Progress of Poesy নামক কবিতাপাঠে বোধ হয় কবির কল্পনা জাগরিত হইয়াছিল। ইহাতে কয়েকজন জগৎ-প্রসিদ্ধ বাণী-বরপুত্রের মুর্ত্তিও অঙ্কিত হইয়াছে। 'নলিনী-বসন্ত' নাটকের পরিচয় প্রসঙ্গে সেক্ষপিয়র ও মিল্টনের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সরস্বতী-পূজক অপর কয়েকজন কবির চিত্র দেখুন,—

"আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি
জগত বিখ্যাত শ্রীবাল্মীকি কবি
দিলেন সারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর প্রফুল্ল মন।

সে ছবি হেরিয়া আরো কতজন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ

আসিল হোমর য়ুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণ রাশি॥

বাজায়ে আনন্দে সমর-তুরী,
যাও কবিবর অবনীপুরী,
শুনায়ে মধুর অমর-ভাষ
ঘুচাও মানব মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে—করোনা ভয়
না যাও কেবল কৃতান্ত ধামে—
যোহানা মিল্‌টন, ডানৃটি নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুইজন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন,
দেখাবে তাহায় অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়।
হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়॥

৫। পরশমণি।—কবি 'বিধাতানির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন'কে পরশমণির সহিত তুলনা করিয়াছেন :—

"পরশ মণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ বচন,—

এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন।
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ।

* * *

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ কাঞ্চন।
স্নেহরূপ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ কানন।
জননী বদন ইন্দু, মরি কি করুণা সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশি-রশ্মি-মাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয় পাত্র গৃহীর কাঞ্চন।
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?"

কি সুন্দর কল্পনা! কি মধুর ভাব! কিন্তু জীবনের প্রভাতকালে যে পরশমণির গুণ বর্ণনে কবি আত্মহারা হইয়াছিলেন, জীবনের সন্ধ্যাকালে কবি সেই

পরশমণি হইতে স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া যে অসীম দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, এই কবিতা পাঠকালে ইদানীন্তন কালের পাঠকগণের নিকট কবির সেই বিষাদপূর্ণ শেষ জীবনের কথা স্মরণপথে উদিত হইবে এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিষাদ ও সমবেদনার তরঙ্গ প্রবাহিত করিবে।

৬। অন্নদার শিব পূজা। ভারতচন্দ্রের পর আর কোন হিন্দু কবির এরূপ মধুর ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কবিতা পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। 'আরম্ভ'র কয়েক ছত্রই কি সুন্দর!—

"দাও করতালি জয় জয় বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ।
বল সবে জয় ত্রিভুবন ময়
অন্নদা আসিছে পূজিতে হরে ;
মর্ত্ত্যে শিবধাম মোক্ষতীর্থ নাম
কাশী বারাণসী অবনীপুরে।"

৭। স্বর্গারোহণ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন দিবসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অকালে স্বর্গারোহণ করেন। সেই ঘটনা উপলক্ষে এই কবিতা রচিত হয়।

অমর কবি মধুসূদনকে অমর কবি হেমচন্দ্র যে অমর কবিতায় শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

"বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু সুধাতে পালিত
কল্পনা হীরার খনি;
বাল্মীকি-হোমর- সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রী ধারী,
অকাল কোকিল, মরুতল তরু
অনীর দেশের বারি।"

গুণীই গুণীর সমাদর করিতে জানেন। হেমচন্দ্র মধুসূদনের গুণ যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনের অবদানের মূল্য কত তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু হেমচন্দ্র তাহা বুঝিয়া ছিলেন, সেই জন্যই তিনি দুঃখ করিয়াছিলেন,

"হবে কি সেদিন এ গউড়মাঝে
পূরিবে তোমার আশা?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা?"

হেমচন্দ্রের হৃদয় অতি মহান্, অতি উদার ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী কবির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যা বা

বিদ্বেষের ভাব ছিল না। সেই জন্য তিনি অকৃত্রিম শোকসূচক এই অপার্থিব কবিতা রচনা করিয়া হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

"অহে বঙ্গ কুলরবি
যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি,—
আকর্ণ পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎ-রঞ্জন ভান,
মধুচক্র সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ
আনন্দ লহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়
গউড় সন্ততি-সার,
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু,
কামিনী-কণ্ঠের হার ;
সাহিত্য কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।"

এই কবিতায় নিম্নদেশে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়াছিলেন ;—

"কিন্তু 'বঙ্গকবি-সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।"

৮। **দুর্গোৎসব।** পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিবেন :এ কবিতাতে পৌত্তলিকতা নাই—হেমচন্দ্রের দুর্গোৎসব যথার্থই শারদীয়া প্রকৃতি-পূজা।

৯। **ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।** ইহা ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত হয়। দুর্ভিক্ষ এক্ষণে আমাদের নিত্যসহচর। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই মহাশ্মশানের মধ্যে বসিয়াও বঙ্গীয় কবিকুল অবিশ্রান্ত প্রণয় গীতি গাহিতে ছাড়েন না। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের সাহিত্যে এরূপ মর্ম্মভেদী কবিতা কেন বিরল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে আধুনিক অধিকাংশ কবির হৃদয় নাই, স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখে ও দুর্দ্দশায় তাঁহাদের হৃদয়

স্পন্দিত হয় না, অথবা দেশের প্রাণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই—বিলাতী গীতিকবিতার অনুকরণই তাঁহাদের যেন সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য—তাঁহাদের কাব্য প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ-উৎসারিত নহে। দুর্ভিক্ষের দেশে বসিয়া পাঠকগণ দুর্ভিক্ষের এরূপ জ্বলন্ত—এরূপ করুণ চিত্র আর কোথাও দেখিয়াছেন কি ?—

"দেখরে চলেছে আহা শিশু কত জন
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী-বদন ;
আকুল জননী তার মুখ চাহি বারবার
অনিবার বারি ধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ !
হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে,
বলিছে কামিনী কেহ, কই নাথ অন্ন দেহ
কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে"—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।
ছুটেছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায়,
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায়।
কেবা কন্যা কেবা পিতা, কে জননী কেবা মিতা
অন্নদাতা, পিতামাতা, আজি বাঙ্গালায়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়।

হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়—
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়
তুলিয়া যুগল পাণি, শিশু ডাকে 'মা' 'মা' বাণী
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল,
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—
নৃত্য করে ভেরী-নাদে, কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ বঙ্গবাসি, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ!"

কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়, দেশবাসীকে কবি দুর্ভিক্ষ দমনার্থ বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন :—

"কেমনে হে বঙ্গবাসি, নিদ্রা যাও সুখে?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে?
নিজ সুত পরিবার না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে, না চাহ কিহে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে?"

১০। **কমল বিলাসী।** ভারত সঙ্গীতের কবি এক অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সরোবরে অসংখ্য নলিনী ফুটিয়া আছে, অসংখ্য প্রাণী অবিশ্রান্ত মধুপানে উন্মত্ত।

"যে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণিচিত্ত-পুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—
যে ভাব পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি' ;—
না পরশে কভু তাদের পরাণ,
জীবন কাটায় করি মধুপান ;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে ধরা চাকরী !"

অকস্মাৎ কবির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি কি দেখিলেন ?—

"হেনকালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন ;—
খেলিছে বঙ্গের উপরি !—

১১। এই কি আমার সেই জীবন তোষিণী ।—কবি কত সুখ-আশা লইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল আশা তিরো-

হিত হইতেছে। কবির হৃদয়ের বেদনা এই কবিতায় অপূর্ব্ব ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা পরে এই আত্মজীবনমূলক কবিতাটীর পুনরুল্লেখ করিব।

১২। সুহৃৎ সঙ্গম।—'বঙ্গদর্শনে' এই কবিতাটী প্রকাশিত করিবার সময় সম্পাদক পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন :—

"লেখকের নিয়োগানুসারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহা রি-ইউনিয়নে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।"

এই কবিতাটী "কলেজ-রিইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে" রচিত হয়। রিইউনিয়নের ইতিহাস হয়ত অনেকে জানেন না। রাজনারায়ণ বসু ইহার প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা ও রায় জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্ম-চরিতে' ইহার ইতিহাস এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

"ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (College Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম District Superintendent of Police হন। যখন আমি তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের District Superintendent of Police ছিলেন। আমি প্রথম এই

প্রস্তাব করি, কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। জগদীশ-নাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে তাহার অন্তর্ভূত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" (Emerald Bower) নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আছে। আমি যে ঘরে উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া কি হইতেছে দেখিতে একটি দর্শক উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই বলিয়া বারণ করিলেন যে "ও ঘরে আর কি দেখিবে? ওঘরে 'সেকাল একাল' হইতেছে।" আমার কলেজের সমাধ্যায়ী ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গালা পুস্তক হইতে বাছা বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময়ে জগদীশনাথ রায় তাঁহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ জন্য বাঙ্গালা সম্বাদপত্র সকল তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মিলনও "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। বিখ্যাত

"শকুন্তলাতত্ত্ব" প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম-এ এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূক অভিনয় (Tableaux Vivants) প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপরে কলেজ সম্মিলন তিন চারি বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। সেবার কোন বেবন্দোবস্ত বশতঃ উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজভ্রাতৃদ্বয়, (যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন) তাঁহাদের বাগানে সম্মিলন হওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তাহার পরবৎসর হইতে লাহাভ্রাতৃদ্বয়, রাজা দুর্গা চরণ ও বাবু শ্যামাচরণ, উক্ত সম্মিলন করাইবার ভার গ্রহণ করেন। কয়েকবৎসর উহা তাঁহাদিগের উদ্যানে হইয়া একেবারে বন্ধ হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে কলেজ সম্মিলন আর হয় না। উহা একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সম্বৎসরের পর বৃদ্ধ ও যুবক কলেজিয়ান একত্রিত হইয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতেন। তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের উদয় হইত তাহা আমার হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ কয়েক পংক্তিতে বিবৃত আছে। কলেজ সম্মিলন আনা-হার ও সৌহার্দ্য রসামৃত পানের Feast of reason and flow of soul অথবা জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার চলাচলি করিবার একটি প্রধান উপায় ছিল।"

বার্দ্ধক্যসুলভ বিস্মৃতিবশতঃ বোধ হয় বসু মহাশয় দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক কলেজ সম্মিলনের বিবরণ লিপি-

বন্ধ করিবার সময় হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক পঠিত 'সুহৃৎ-সঙ্গম' নামক কবিতার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই কবিতাপাঠসম্বন্ধে তাঁহার যে স্মৃতিকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"The poem সুহৃদ সমাগম was written for and read at a gathering held at Emerald Bower, the garden-house of Maharaja Sir Jatindra Mohan Tagore in 1876. I was present with my brother on the occasion. In the presence of a distinguished audience consisting among others of the Maharaja, Dr. Mahendra Lal Sarcar, Babu Bankim Chandra Chatterjee, Mahamahopadhyay Mohesh Chandra Nayaratna, the poet himself read the poem sitting on a garden seat under a tree. I have a vivid recollection of what took place that afternoon. The poem made great impression on every one."

এই কবিতায় কবিবর তাঁহার স্বর্গগত বন্ধু—বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন :—

"কোথা সে আজিরে ক্ষণজন্মা ধীর
দ্বারিক সুহৃৎ বঙ্গের মিহির।

কোথা অনুকূল মলয় সমীর।
দীনবন্ধু বঙ্গসাহিত্যসুরী?
শ্রীমধুসূদন কোথা সে এখন।
তার তরে আজ কে করে রোদন
সহপাঠী তার? এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাততারা।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার সময় পরে ছিল—

"হে বঙ্কিম, সখে তোমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,
নাম গন্ধ শোভা কিছুই না রবে
কালেতে হইবে সকলি হারা!"

এই পংক্তিগুলি পরে এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—

"কিছুদিনে আর আমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
নাম গন্ধ শোভা কিছুই না রবে
কালেতে হইব সকলি হারা।"

'বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ'।—চারি বৎসর অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদায় গ্রহণ কালে লিখিলেন, "চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম।

আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।" বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের বিলোপ সাধন করেন তখন 'বান্ধব' 'আর্য্য-দর্শন' প্রভৃতির আবির্ভাব সত্ত্বেও বঙ্গদর্শনের অভাব দেশে ছিল। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছিলেন বঙ্গদর্শনের প্রতি কখনও "পাঠক শ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনরূপ 'গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র নহি' বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিলেও সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকেই যোগ্যতম পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র বিলোপসাধনের প্রকৃত কারণ কি, তাহা এতদিন আমাদের কৌতূহলের বিষয় ছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্রের 'হাতে গড়া' লেখক প্রবন্ধের দক্ষিণা লইয়া কিছু গোলমাল করায় বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া 'বঙ্গদর্শন' উঠাইয়া দেন।

হেমচন্দ্র কখনও পয়সার জন্য গ্রন্থরচনা করেন নাই। তিনি সকল সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে রচনা ও সৎপরামর্শ দ্বারা সাহায্য ও উৎসাহদান করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্য হেমচন্দ্রের নিকট অশেষ ঋণী ছিলেন। 'বঙ্গ-দর্শনের বিদায় গ্রহণে' সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র সহযোগিগণের

নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কালে হেমচন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।"

যাহা হউক, 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ'-কালে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাও লিখিয়াছিলেন যে :—

"আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।"

'বঙ্গদর্শনের' প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল—'বঙ্গদর্শন' পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। তখনও হেমচন্দ্র রচনাদি দ্বারা উহাকে দীপ্তিদান করিয়াছিলেন। সে কথা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

হাইকোর্টে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা।—যখন দরিদ্রসন্তান হেমচন্দ্রকে সারদা তাঁহার অক্ষয় বীণা প্রদান করিয়া যশের হৈম মুকুটে বিভূষিত করিলেন, তখন কমলাও তাঁহার সপত্নীর বরপুত্রকে সুখৈশ্বর্য্যদ্বারা প্রলোভিত করিতে বিরত হন নাই। যখন সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার কবিসিংহাসনে হেমচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাটে রাজটীকা প্রদান করিলেন, যখন সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিসম্রাট হেমচন্দ্রের সৃষ্ট অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার যশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। হাইকোর্টে তখন হেমচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিপত্তি। পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"হেম বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁহার লিখিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভূমিকা পাঠে। তাহা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। তখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' আমাদের বি-এ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক ছিল। তখন তাঁহার সহিত চাক্ষুষ ঘটে নাই। তাহার পর বহরমপুরে থাকা কালে 'বঙ্গদর্শনে' এবং অন্যান্য পত্রে হেমচন্দ্রের কবিতা পাঠ করি। তন্মধ্যে Shelley's Sky



স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (যৌবনে)

Lark এর অনুবাদ 'ভরতপক্ষীর প্রতি' শীর্ষক কবিতাটী পাঠ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। ইংরাজী কবিতার এমন সুন্দর বাঙ্গালায় অনুবাদ তাহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হেম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ হয়—হাইকোর্টে। তখন অন্নদা বাবু হাইকোর্টের সিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং জগদানন্দ বাবু জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার। হেম বাবুর তখন খুব পসার। তিনি যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তেমনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। তখনকার প্রধান উকীলদের মধ্যে শ্রীনাথ দাস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিনীমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আমি অতি আগ্রহের সহিত হেমবাবুর নিকট পরিচিত হইতে যাই এবং তাঁহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি,তিনিও আমার প্রতি সেইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করেন। সেই স্নেহের ভাব বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। আমি যেমন তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের অনুরাগী ছিলাম, তিনিও সেইরূপ আদর করিয়া তাঁহার রচিত কাব্য ও কবিতাগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাকে শুনাইতেন।"

হেমচন্দ্রের প্রসার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ গল্প আমরা স্যর গুরুদাসের নিকট শুনিয়াছি, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য :—

কোন এক মোকদ্দমার এক পক্ষে রমেশবাবু ও হেমবাবু ছিলেন, অপর পক্ষে উঁহাদের অপেক্ষা নিম্ন-



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেণীর দুই একজন উকীল ছিলেন। মোকদ্দমাটী দ্বারকানাথ মিত্র এবং আর একজন বিচারপতির সম্মুখে চলিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষের মোক্তার অপর পক্ষের মোক্তারকে একদা বলিতেছিল, "তুমি তো দুই বাঘা ভাল্‌কো উকীল দিয়াছ, তোমার আর ভাবনা কি?"—এই কথা শুনিয়া রহস্যপ্রিয় হেমবাবু (জজেরা তখন টিফিন করিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন) বলিয়া উঠিলেন "(রমেশ বাবুকে উদ্দেশ করিয়া) বাঘাটা ত পালিয়েছে* আর (নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ভল্লুকটা তো (ব্রিটিশ সিংহের ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিরূপে উপবিষ্ট দ্বারকানাথ মিত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া) সিংহের তাড়ায় অস্থির হ'য়েছে।"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি দিবসে "অতুল্য দ্বারিক—বঙ্গের মিহির" চিরদিনের জন্য বঙ্গাকাশ হইতে অস্তমিত হন। তাঁহার স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র বিচারপতি নিযুক্ত হন। রমেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র একই সময়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য এক ছিল। বহুবৎসর

---

*রমেশ বাবু সেদিন কোন কারণে অনুপস্থিত ছিলেন।



স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র (যৌবনে)

পরে রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোক-গাথায় অন্ধ হেমচন্দ্র পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"যৌবনে যশের আশা, একত্র বিজয় তৃষা
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয়।"

হেমচন্দ্র রমেশচন্দ্র অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন না। বরঞ্চ আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলেন, রমেশচন্দ্র অপেক্ষা হেমচন্দ্রের তর্কশক্তি ও বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অধিকতর ছিল। শুনিয়াছি, এই সময়ে হেমচন্দ্রকেও বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিবার কথা উঠিয়াছিল। হেমচন্দ্রের জননী তাঁহাকে এই পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে বিচারাসনে বসিবার পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, পাঁচ বৎসর যে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে না করিতে শম্ভুনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন, সাত বৎসর যে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে না করিতে দ্বারকানাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান হেমচন্দ্র যেন সে বিচারাসনে বসিবার ইচ্ছা না করেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে হেমচন্দ্র বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন নাই। কারণ বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইলে হয়ত হেমচন্দ্রের প্রতিভা বৃত্রসংহার মহাকাব্য প্রণয়নে নিযুক্ত হইয়া

বিকাশপ্রাপ্ত না হইয়া ল-রিপোর্টের নীরস পৃষ্ঠাগুলিতে সুদীর্ঘ বিচারতর্কে আত্মপ্রকাশ করিত।

রমেশচন্দ্রের নিয়োগে উদারহৃদয় হেমচন্দ্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর প্রণয় চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষের ছায়াও কখন তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। হেমচন্দ্র স্বয়ং বিচারপতির পদলাভ অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন পছন্দ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার আয়ও সামান্য ছিল না। এই সেই প্রতিপত্তির গৌরবময় সময়, যখন হেমচন্দ্র, নটরাজ অমৃতলাল বসুর ভাষায়, "হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায়।"

সমাজে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি।

বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয়। অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকিলে সমাজে অতুলনীয় প্রতিপত্তি হয়। সমাজে এই সময়ে হেমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিনি একদিকে যেমন বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অর্থের জন্য, কেবল প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্য,তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা

লাভ করেন নাই। তিনি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব স্বভাবের মাধুর্য্য, মিষ্টভাষিতা, উদারতা ও পরহিতৈষণার জন্য সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিতেন বটে কিন্তু সে অর্থ অধিকাংশই পরার্থে ব্যয়িত হইত। তিনি যথার্থই বিশ্বাস করিতেন—

"পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।"

হেমচন্দ্র দানে মুক্ত হস্ত এবং দরিদ্রসেবায় অপরাঙ্মুখ ছিলেন। তিনি গোপনে দান ও পরোপকার করিতে ভালবাসিতেন, প্রশংসা লাভের জন্য কখনও সমুৎসুক ছিলেন না। তাঁহার সৎকার্য্যসমূহ নীরবে লোকের অগোচরে সম্পন্ন হইত। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে, যখন মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ,পিতৃশ্রাদ্ধাদির জন্য নীলমণি কুমার মহাশয় হেমচন্দ্রকে তাঁহার জন্য বন্ধুদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। হেমচন্দ্র পরদিন তাঁহার নিকট অনেকগুলি টাকা (কত টাকা মনে নাই) তাঁহাকে দিয়া যান। সে টাকার অধিকাংশই যে হেমচন্দ্রের নিজ ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার প্রিয়ভাষিতা ও সদালাপ-প্রিয়তা সম্বন্ধে স্যর গুরুদাস বলেন :—

"তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ও সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে এত সুখে সময় কাটিয়া যাইত যে লোকে জানিতে পারিত না এত সময় গেল। পূজার বন্ধ হইলে কেবল ভেকেসন বেঞ্চ বসিত। সেই সময়ে হেম বাবু এক আধ দিন বেড়াইতে আসিতেন এবং সেই সময় গল্প করিতে ভালবাসিতেন। এক এক দিনের বৈঠকে ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত উকীলদের লাইব্রেরীতে তাঁহার গল্প চলিত এবং যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া সেই সমস্ত গল্প শুনিতেন।"

বাস্তবিক রঙ্গপ্রিয় হেমচন্দ্র সভায় আসর জাঁকাইতে অদ্বিতীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর ন্যায় হেমচন্দ্রও সভায় গল্প ও হাসির তুফান তুলিতে পারিতেন।

প্রধানতঃ এই সকল গুণেই হেমচন্দ্র সমাজে অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন, কোথাও কবির গান হইলে হেমচন্দ্রই বিচারকের আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইতেন এবং হেমচন্দ্র কোন পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ধ্বজা প্রদান করিলে প্রতিপক্ষের তাহাতে কোন ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

বাস্তবিক কি সাহিত্য জগতে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি স্বজাতি-সমাজে সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের এই সময়ে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবির ভাষায়

"বারের উজ্জ্বল রবি
বঙ্গদর্শনের কবি"

হেমচন্দ্র বাস্তবিকই তখন সহস্র সহস্র নয়নের প্রীতির আধার, সহস্র সহস্র হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা। সেই বিনয় ও সৌজন্যের অবতার, সেই দয়া ও করুণার আধার, সেই উৎসাহ ও স্বদেশ প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি, সেই জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগীর গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমাদের অক্ষম তূলিকায় কিরূপে চিত্রিত করিব? পাঠকগণ মানসনয়নে তাহা প্রত্যক্ষ করুন। সারদা ও কমলা উভয়েরই প্রসন্ন দৃষ্টি সেই প্রতিভা-উজ্জ্বল আননে পতিত হইয়াছে। দরিদ্রসন্তান হেমচন্দ্রের একদিকে কমলা অক্ষয় সুখ ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, এবং অপর দিকে বীণাপাণি চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি ও শুভ্র যশের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতেছেন। আমরা পর পরিচ্ছেদে দেখিব, কাহার প্রসাদলাভের জন্য হেমচন্দ্র উদ্‌গ্রীব ও উন্মত্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

'বৃত্র-সংহার'—প্রথম খণ্ড।

মধুসূদনের স্বর্গারোহণের পর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে মহাকবির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাটে রাজটীকা প্রদান করিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। এক্ষণে সেই কবিসম্রাট যে অপূর্ব্ব মহাকাব্য রচনা করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদবধের টীকা লেখেন, বোধ হয়, তৎকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্র-সংহার সেই ইচ্ছার ফল।" রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত একস্থানে লিখিয়াছেন, "একথা শতবার স্বীকার্য্য যে মেঘনাদের মূল আদর্শেই বৃত্রসংহার বিরচিত এবং 'মেঘনাদ' না হইলে

'বৃত্রসংহার' হইত কি না সন্দেহ।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেঘনাদবধের টীকা লিখিবার অব্যবহিত পরে হেমচন্দ্র দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যে সকল কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোনটিতেই মাইকেলের বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। বৃত্রসংহারের আদর্শ ও মেঘনাদবধের আদর্শে যে কতদূর প্রভেদ আছে তাহা আমরা বৃত্রসংহার দ্বিতীয়খণ্ডের আলোচনার পর কোনও পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। আমরা এমন কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না যাহাতে অনুমান করা যায় যে 'মেঘনাদে'র আদর্শে ও অনুকরণে 'বৃত্রসংহার' রচিত হইয়াছিল। 'মেঘনাদবধ' যে আদর্শ দৃষ্টে রচিত হইয়াছিল, 'বৃত্রসংহার'ও সেই আদর্শ দৃষ্টে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দৃষ্টে রচিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কারণ হেমচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না—মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবির গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সুতরাং আমরা এরূপ অনুমানের সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। এরূপ অনুমান করিলেও বিশেষ কিছু লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে (১৮ই পৌষ

১২৮১ সালে) 'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে 'কলিকাতা গেজেটে' নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।—

"পুস্তকের নাম বৃত্র-সংহার or the Slaughter of Britra বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কাব্য। ষ্ট্যানহোপ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩ অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ ১০০০ ছাপা হইল। মূল্য ১৲ এক টাকা। গ্রন্থস্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর। মন্তব্য: Britra, a giant or demon managed by his bravery to expel Indra and other minor gods from their celestial abode; but by much intercession with Brahma, Indra was told to manufacture a thunder-bolt, with which he at length killed Britra".

বৃত্রসংহারের বিষয় মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বে বিবৃত ইন্দ্রকৃত বৃত্রবধের উপাখ্যান। হেমচন্দ্র এই "পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত করিয়াছেন।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ভাষায়, "মহাভারতবর্ণিত অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্রবধ বিবরণকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া কবি কল্পনাবলে

তদুপরি এই বৃত্রসংহার কাব্যরূপ বিশাল প্রাসাদের গঠন করিয়াছেন।"

আমরা এক্ষণে বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ডের দোষ গুণের বিচার করিব না। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার পর সমগ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সন ১২৮১ সালের মাঘ ও ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র উহার যে বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করেন তাহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"হেমবাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নির্ব্বাচন সাধ্য নহে; অর্দ্ধনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না, শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখিয়াই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না; অল্পমাত্র দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন, যে বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া

এরূপ সুখ অনেকদিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না।! এরূপ কাব্য সর্ব্বদা জন্মে না।"

আসুন পাঠকগণ, আমরা এই "বিশাল প্রাসাদে"র একাংশই এক্ষণে আর একবার পরিদর্শন করি। আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে বাঙ্গালা কাব্যের এই অপূর্ব্ব তাজমহলের সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রতিভাসিত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু রসসুধাকর বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে উহার মাধুরী হয়ত কিয়দংশও আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, আমাদের হৃদয় যমুনায় উহার সৌন্দর্য্যের ক্ষীণতর ছায়াও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিব।

প্রথম সর্গ। প্রথম দৃশ্য পাতালে।

"স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্য ; অধোদেশে তার
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধোতে
অন্ধতম পুরী"—

সেই "বিষম পাতালে" বৃত্রজিত নির্ব্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। পাতালের সে দৃশ্য কি ভয়ানক এবং স্বর্গচ্যুত, হৃতজ্যোতিঃ দেবগণের অবস্থাও কি ভয়ঙ্কর!—

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ বিমর্ষভাব চিন্তিত আকুল ;

নিবিড় ধূম্রান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি।

যোজন সহস্রকোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল বিধূনিত সদা;
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর,
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত,
মলিন নির্ব্বাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে;

কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে,
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু,—
তেমতি অমর কান্তি ক্লান্ত অবয়বে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'নিবিড়ধূম্রল ঘোর' সেই পাতাল-পুরীর মধ্যে সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর!—

চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব,
ক্রমে দেব-বৃন্দ মুখে ফুটে ঘন ঘন
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ঘন ঘনচ্ছাস
বহে ঘুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর।"

স্বর্গচ্যুত দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন ভীমশব্দপূর্ণ সভা-তলে বসিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।" দেবরাজ ইন্দ্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি কুমেরু শিখরে নিয়তির আরাধনা করিতে ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে সভায় দেবসেনাপতি স্কন্দ গম্ভীর স্বরে মেঘমন্দ্রে বক্তৃতা করিলেন এবং উপসংহারে উদ্দীপনার স্রোত প্রবাহিত করিয়া বলিলেন :—

ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।

ধিক্ সে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্যপদ রজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।

বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্য ভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?

স্কন্দের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শুনিয়া দেবগণ বিচলিত হইলেন—

যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গীরণ আগে,
অগ্নির—ভূধরে ধূম সতত নির্গমে,
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী,
পার্ব্বতী-নন্দন-বাক্যে সেইরূপ দেবে।

অনন্তর দেব বৈশ্বানর জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সে ভাষার প্রতি অক্ষরে অনলপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়াছে, উৎসাহের বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন এরূপ ঘৃণিত অবস্থায় কাল-যাপন করা অনুচিত—

তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমর বীর্য্য সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ।

নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?
দেব কি দানব কিংবা মানব সন্তানে?

সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।

ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।

দেবগণ অগ্নির বাক্যে উন্মত্ত হইলেন—"ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।"

তখন প্রশান্তমূর্ত্তি প্রচেতা গম্ভীরভাবে বলিলেন :

তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্‌ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।

যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে?
কে আছে নারকী হেন দেব-নাম-ধারী
দ্বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে?

তথাপি প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ আগে
উচিত ভাবিয়া দেখা ফলাফল তার ;
সামান্যের(ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।

কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি ?
সর্ব্বজন হাস্যাস্পদ হয়ে কিবা ফল ?
অসিদ্ধপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপী ;
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।

অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে।

অগ্নি বলিয়াছিলেন, সাহস দ্বারা নিয়তিকে জয় করা যায়। তাহা কি সত্য ?

ভাগ্য নাই ! ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ !
সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর !
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে ?

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া প্রচেতা অসঙ্কুচিত চিত্তে বৈশ্বানরের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ;—

দেবগণ মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ,
যতদিন ইন্দ্র আসি না হন সহায়।

তদনন্তর সূর্য্যদেব বক্তৃতা করিলেন। তিনি অগ্নিময়ী বক্তৃতায় অগ্নিদেবের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন :—

মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে
দহ হে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগনব্যাপী অনন্ত সমর !

জ্বলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্র পরম্পরা ঘোর চির শোকানলে।

চির যুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোনকালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্টিতে কভু দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।

অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চির যুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।

এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইল। দেবগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ। দৃশ্য ইন্দ্রালয়ে নন্দনকাননে। বঙ্কিমের ভাষায়, "প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ

তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দনবনে বৃত্রমহিষী ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া!"

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত পবনের মাধুর্য্যের ন্যায় একটি মাধুর্য্য আছে—কিসের সে মাধুর্য্য, পবন মাধুর্য্যের ন্যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ পূরে না।" তিনি রতির নিকট ইন্দ্রাণীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন—

শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।

গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে॥"

তিনি বৃত্রের নিকট আবদার করিলেন, শচী তাঁহার দাসী হয়—

থাকিবে নিকটে, শিখাবে বিলাস,
ধরিব হৃদেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই।

বৃত্র রমণীর বাক্যে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বীরত্বের গৌরব ভুলিলেন, ধর্ম্ম ভুলিলেন, দেবরাণীকে নৈমিষারণ্য হইতে আনয়ন করিয়া দানবীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া রমণীর অসম্মান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইল। যে অপূর্ব্ব তপস্যার বলে বৃত্র স্বর্গজয়ী হইয়াছিলেন, তাহার ফল নষ্ট হইতে চলিল।

তৃতীয় সর্গ।—বৃত্রাসুর সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন,—

ত্রিনেত্র বিশাল বক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—
নিশান্তে গগন পথে ভানুর ছটায় ,
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায় ।
ভ্রূকুটী করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে ।
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্‌টনের যোগ্য । বৃত্রসংহার কাব্যের মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে ।" *

* কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান । তিনি "আমার জীবনে" লিখিয়াছেন—"তাহার পর বঙ্গসাহিত্যের কথা, পলাশীর যুদ্ধ বৃত্রসংহার, ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে উহার প্রথমভাগের সমালোচনার কথা উঠিল । বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে । তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে ?' আমি বলিলাম 'আমি, হেমবাবুর শিষ্যস্থানীয়, আমার আবার মত কি ? আমার বেশ লাগিয়াছে ।' অক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা । তিনি বলিলেন 'মন্দ কাহারও লাগে নাই । তবে "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব

মদন ও রতি অন্যান্য দেবগণের সহিত পাতালে আছে অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।' বঙ্কিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে, আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রী দিলাম।" পাণ্ডিত্যাভিমানী অক্ষয়চন্দ্রের 'কবি হেমচন্দ্র' শীর্ষক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট বিদ্বেষভাব ছিল, সুতরাং তাঁহার ঈর্ষান্ধ নয়নে হেমচন্দ্রের কাব্যসৌন্দর্য্য যে যথাযথ ভাবে প্রতিভাসিত হয় নাই তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার প্রতি বিদ্রূপ করিবার মত কাহারও শক্তি বা সাহস ছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি, তিনি স্বীয় নির্ভীক মত অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যক্ত করিতেন, কখনও কাহারও ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রতিবাদে তিনি 'অপ্রতিভ' হইবার ব্যক্তি ছিলেন না অথবা অন্য কাহারও নিকট স্বীয় মত সমর্থনের জন্য আপীল করিবার লোক ছিলেন না। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতে তাঁহার মতের সমর্থন করিলেও, অপর এক স্থলে (আমার জীবন ২য় ভাগ ২য় সংস্করণ ২২১ পৃষ্ঠা) বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত বৃত্রসংহারের 'পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'—সম্বলিত দীর্ঘ সমালোচনা যে পক্ষপাতদুষ্ট এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা যে নবীনচন্দ্রের নৈতিক সাহসের অভাবের ও হেমচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।—

পলায়ন করেন নাই, তাঁহারা স্বর্গে বৃত্র এবং তাঁহার মহিষীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "নহিলে অসুরলব্ধ স্বর্গের প্রকৃতি ভ্রংশ হয়! দূরদর্শী কবি এইটুকু ভুলেন নাই।" বৃত্রের আদেশানুসারে মদন শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী একমাত্র সঙ্গিনী বিদ্যুৎকে লইয়া নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন। বৃত্র সভারূঢ় হইয়া আদেশ করিলেন, ভীষণ নামক মহাপরাক্রান্ত অসুর তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হউক।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে মন্ত্রী সংবাদ দিলেন যে সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গ-নিরোধ করিতে আসিয়াছেন। বৃত্র এ সংবাদে আস্থা স্থাপন করিলেন না। অবশেষে প্রধান রক্ষক যেরূপ লক্ষণ দেখিয়া দেবাগমন অনুমান করিয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "সে কয় পংক্তি অমূল্য রত্ন।"—

কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য, "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ!
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার,
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার,

ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়।
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশ প্রান্তে বেরি চারি ধার,
বহুদূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।

—এই বর্ণনা শুনিয়া বৃত্রাসুরের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। তখন অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল—

বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে,
কোদণ্ড টঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা।

চতুর্থ সর্গ।—দৃশ্য নৈমিষারণ্য। এই সর্গে ইন্দ্রাণী সখী বিদ্যুতের নিকট স্বর্গচ্যুতিদুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বৃত্রসংহারের জন্য বজ্র সৃষ্ট হয়, বজ্র সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া কবি 'বৃত্রসংহার কাব্যের' ভূমিকায় এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

"এই পুস্তকে বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত

হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুচ্ছটার প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র নিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্র সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।"

এই কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"দেখা যাইতেছে যে কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তাঁহার মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে—যে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িবে, তাহারা অধিকাংশই আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মূর্খ সমালোচকেরা ইহা সমালোচনা করিবে। সুতরাং মূর্খ সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া কথাটি বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এ বিনয়ের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এ সময়ে ভবভূতির গর্ব্বোক্তি মনে পড়িল। যে এই মনোমোহিনী বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রশংসা না করিবে, সে তাঁহার এই মহাকাব্য পড়িবার যোগ্য নহে। যে গ্রন্থ পড়িবার যোগ্য নহে, তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।"

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব :—

"হেমবাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী, সুসঙ্গতা, এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিতা। আমরা বলিতে পারি না, কবির কি অভিপ্রায়, কিন্তু আমাদিগের এমন একটু ভরসা আছে যে বজ্র সৃষ্ট হইলে, কাব্য মধ্যে সুন্দরী চঞ্চলা এবং মহাবীর বজ্রের পরিণয় দেখিতে পাইব—চিরপ্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ বাহ্য প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ, বাঙ্গালার কবির গানে গীত হইবে। আমাদিগের এ সাধ কি পূরিবে?" *

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "চঞ্চলার নিকটে শচীর বিলাপ, অতি মধুর, অতি সকরুণ। ··· ইহা সম্পূর্ণরূপে দেবীর যোগ্য। ······ এই শচীবিলাপ হইতে উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্বপনে যদ্যপি ছাই সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।

* বৃত্রসংহারের পাঠকগণ জানেন যে দ্বিতীয় খণ্ডে হেমচন্দ্র এ সাধ পুরাইয়াছিলেন।

সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
হায় এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ!
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ!
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে সকলি হেথা স্থূল!
নিত্য এ খর্ব্বতা জ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল!
অমর—মরণ নাই, কতকাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব,
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব।
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ।
কি রূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ!

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র বলেন—"আছাড়ি বিছাড়ি কাঁদিলেই করুণরস হয় না। স্বর্গভ্রষ্ট শচীর আক্ষেপের

অংশটি পাঠ করুন, ইহা আমাদের প্রতিবাসিনীবর্গের নানা ছন্দোময়ী ক্রন্দনের সুর হইতে কত পৃথক। উহা স্বর্গভ্রষ্টা দেবরাণীর যোগ্য আক্ষেপ। ইহার কারুণ্যের মধ্যে মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে, কবি ভুলিয়া যান নাই যে দেবরাণী কাঁদিতেছেন, পথের ফকিরাণী কাঁদিতেছে না।

আমার সে নন্দন বিপিন
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়
পারিজাত কে করে মলিন!
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম
দৈত্যবালা পরিছে গলায়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও দুঃখের কথা আছে। পবিত্রতা রূপিণী দেবরাণী অসহ্য ক্ষোভে ও লজ্জায় বলিতেছেন—

হায় লজ্জা! চপলা রে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা।
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইল কোনজন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা!

দেবরাণীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি দৈত্যরমণী পরিয়া অপবিত্র করিয়া দিতেছে, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

আমার সপ্তকী বাজে, ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!
আমার মুকুট রত্ন, কুবের আনিয়া দেয় তায়!

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক ও কৈলাসের দেবীরা আর নন্দন বনের ত্রিসীমায় আসিবেন না, অপমানিতা শচীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন—

আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী
লইতে ইন্দিরা পুষ্পঘ্রাণ।
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।

এই উক্তিগুলি করুণরসের সার বলিয়া মনে হয়, অথচ ইহাতে আমাদের চিরশ্রুত কান্নার অনুনাসিক স্বরটি নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "এই কাব্যে হেমবাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ,এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচীবিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি।

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে;
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে।
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে।

হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে !

মদন প্রভু বৃত্রকে শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শচীর নিকট বিশ্বাসঘাতক নহেন। শচীকে ধৃত করিবার ব্যবস্থা শুনিয়া তিনি অবিলম্বে শচীকে সংবাদ দিতে নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, এই স্থানে কবি "অকস্মাৎ প্রথম শ্রেণীর নাটককারের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। স্বদলত্যাগী অসুরদাস কামদেবকে দেখিয়া দেবীদ্বয় ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। চপলার ব্যঙ্গ তৎস্বভাবানুযায়ী, স্পষ্ট স্পষ্ট, উগ্র, তপ্ত, এবং চাপল্যব্যঞ্জক, যথা—

শুনি না কি মাল্যকার হৈয়ে এবে আছ মার !
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও ?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানব বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও ?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার !
থাকিতে সে অন্তমনে, ত্যজি পুষ্প শরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি
বেড়াইতে মনোহর বেশে।

ত্যক্ত করি বারে বারে. সর্ব্বলোক সবাকারে,
শুন, কাম, এই তার শেষে ॥

শচীর ব্যঙ্গও শচীর যোগ্য এবং গূঢ়ার্থ। যথা—

শচী কহে চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম,
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি স্বর্গপুরী পরিহরি.
পুরাইত কিবা মনস্কাম ?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্ব ঠাঁই,
চিরজীবী হউক সেজনা।
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহেনা সে এ পোড়া যাতনা।
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয় ;
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময় ?"

কন্দর্পের উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।—

কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।
সুখদুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় বা ত্রিভুবনে
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।

কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা,
না পাইবে গিয়া অন্তস্থান ॥
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা
সুখ দুঃখ মনের খনিতে ॥

কাম শচীহরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন। শচী এই সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন, পরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তপোনিরত ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন।

জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ।
জয়ন্ত পাতাল দেশে, শুনিলা ক্ষণ-নিমেষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি।
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে,
অবনীতে চলিলা তখনি ॥

পঞ্চম সর্গ। জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চপলা শচীকে বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে কিংবা ব্রহ্মলোকে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন :

ইন্দ্রাণী চপলা বাক্যে কহে, "কিবা কহ,
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ সদা চিত্তে মলা
আশ্রয়দাতার মতি গতি বুঝে চলা ;
চিন্তিত সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই !
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস ,
সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার !
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !

তখন চপলা ছদ্মবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এ পরামর্শও দেবরাণীর মনঃপুত হইল না—

———"শুনলো চপলা।
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
চির দিন যেই রূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর (ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্তে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।

নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয়।
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন।

অনন্তর চপলা সেই মূর্ত্তির শোভনোপযোগী মায়াবনের সৃষ্টি করিলেন। যে অপূর্ব্ব ভাষার সাহায্যে কবি তাঁহার এই সুন্দর কল্পনাটিকে গঠন দিয়াছেন বাহুল্য-ভয়ে তাহার পরিচয় দিতে পারিলাম না।

মায়াবন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এদিকে জয়ন্ত মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে মাতাপুত্রের পুনর্ম্মিলনের স্বর্গীয় দৃশ্য মাতৃভক্ত কবি হেমচন্দ্রের তুলিকায় অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে :—

"জননী পুত্রের মুখ বহুদিন পরে
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে,
অন্য আশা, অভিলাষ. ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার—
প্রভাতে যেমন সূর্য্যতরুণ কিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্ঝটি হরণ।
পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইল আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারংবার শিরঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ,

লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ,
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ সলিলে,
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়-রাজি,
বসন্ত প্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি,
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি,
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি,
শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী,
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।

অতঃপর মাতাপুত্রে অনেক সস্নেহ ও সকরুণ কথোপকথন হইল। জয়ন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। এদিকে চপলা বনমধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতে করিতে দূত-সহ অসুর সেনাপতি ভীষণের সাক্ষাৎ পাইলেন। ভীষণের সহিত কিয়ৎক্ষণ রঙ্গ করিয়া চপলা অকুতোভয়ে তাহাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন। অসুর-দ্বয় দেবরাণীর সেই গৌরবমণ্ডিত তেজোময় আকৃতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময় জয়ন্ত আসিয়া ভীষণের প্রাণসংহার করিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ। এই সর্গের প্রারম্ভে দেখিতে পাই, দেবগণ' স্বর্গ নিরোধ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধবর্ণনা বাঙ্গালাভাষায় অতুল্য; মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য।" উহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধার যোগ্য—

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া,
　　দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
　　অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল,
　　অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা,
　　বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ, দীর্ঘ উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
　　জাগ্রত, সুসজ্জ-সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
　　ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
　　আচ্ছাদি সুমেরু অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
　　ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈল বৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে,
রাত্রি দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমর বহ্নি নিত্য অহরহঃ.
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ় সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের উর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু অভিমুখে।
অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল,
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে,
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে।
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

বিরক্ত হইয়া বৃত্র দানবগণকে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবপ্রদত্ত ত্রিশূল

আনিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জন্ম বৃথা। কর্ম্ম বৃথা। বৃথা বংশখ্যাতি।
কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়।

বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা।
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,—
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়।

বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত।

সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।

যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান।
বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন,
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

কর অভিষেক, পিতঃ এ দাসেরে আজ
সেনাপতি পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎ ত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু।

ইহার উত্তরে বীরশ্রেষ্ঠ বৃত্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও উদ্ধারযোগ্য :—

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে,

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃ প্রভা, পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানব তিলক।

তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া!

অনন্ত তরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলা গর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর,
গভীর শর্ব্বরী যোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয় দেখিলে যে সুখ—

কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বত শৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত !

তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত ;
সমর-তরঙ্গে পশি খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত !

সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল !
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পূরাইতে সাধ ।

নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর !

যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র অমর ধ্বংসিতে

যাও যশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।

এমন সময়ে দূত ভীষণ-বধের সংবাদ বহন করিয়া আনিল। তখন ক্রুদ্ধ দৈত্যপতি পুত্রকে শচী আনয়নে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন। মন্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিলেন দেবতারা স্বর্গ-নিরোধ করিয়াছেন, কুমার কি প্রকারে ব্যূহভেদ করিয়া যাইবেন। বৃত্র পুত্রের সহিত শত যোদ্ধা ও শিবদত্ত ত্রিশূল দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে শিবত্রিশূল না থাকিলে পুরীরক্ষা শঙ্কট হইবে। তখন বৃত্র ভ্রূকুটি করিয়া ললাটে অঙ্গুলিদ্বয় স্থাপিত করিয়া বলিলেন—

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার।"

রুদ্রপীড় কিন্তু ত্রিশূল লইলেন না। শত যোদ্ধা মাত্র সঙ্গে লইয়া শচীহরণের জন্য মর্ত্তে গমন করিলেন।

সপ্তম সর্গ। দৃশ্য কুমেরু শিখরে। এই সর্গে আমরা কাব্যনায়ক ইন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। ইন্দ্র নিয়তির তপস্যায় নিযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র

বলেন, "নিয়তি হেমবাবুর সৃষ্টি। সত্য বটে, গ্রীসীয় দেবতাদিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আছেন, কিন্তু হেমবাবুর নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্ন প্রকৃতি। হেমবাবুর এই সৃষ্টি অত্যন্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নিয়তি অস্মদ্দেশীয় পুরাণেতিহাসে নামপ্রাপ্ত নহেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই ঐশী শক্তির অতীত আর একটী শক্তির অধীন দেখা যায়। যাঁহারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তাঁহারাও সর্ব্বশক্তিমান্ বা ইচ্ছাময় নহেন। তাঁহাদিগকেও উদ্যোগ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে হয়, এবং সময়ে সময়ে বিফলযত্ন হইতে হয়। দশবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে পৃথিবীর ভার মোচন, বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাদেব সমুদ্র-মন্থন করাইয়াও বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাদিগের ত কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার বিফলতা থাকিলেই সুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির এই সুখ দুঃখ কোন শক্তিতে? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন। সে দেহও অতি ভয়ঙ্কর—

পাষাণের মূর্ত্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি স্নেহ কিম্বা অনুকম্পা-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিয়ত দর্শন
করতলম্বিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।
অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট কভু।

যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তির এই মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটি কৌতূহলের ব্যাপার দেখাইব—বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্নলিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্ত্তন দেখিতে-ছেন—

"পূর্ব্বে সে নিরখি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গ বিভূষিত,
লতা গুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া।

গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে,
তরু বারি বিরহিত তাপদগ্ধ-দেহ।

নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ ;
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে।

আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য, পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিনখানি অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং লিয়রে বা হ্যাম্‌লেটে কখন কখন আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। প্রাকৃত-বিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেমবাবু তাহা উপরিধৃত কয় চরণে দেখাইয়াছেন।" নিয়তির সাক্ষাৎ পাইলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন কবে কি উপায়ে বৃত্র নিহত হইবে। নিয়তি তাঁহাকে শিবলোকে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র দেবদূত স্বপ্নের দ্বারা এ সংবাদ দেবতাগণের নিকট প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাসধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম সর্গ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "অষ্টম সর্গ, আদ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ন্যায় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। আমরা সর্গটি সমুদয় উদ্ধৃত করিতে পারি না, কিন্তু সমুদয় উদ্ধৃত না করিলেও, ইহার রাশি রাশি সৌন্দর্য্য, ইহার চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না— নিদাঘকালীন পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় ইহা আদ্যোপান্ত সুপ্রফুল্ল কবিতাপুষ্পে মণ্ডিত।

ইন্দুবালার প্রকৃতি অতি মনোমোহিনী।

মাধুরী লহরী, অঙ্গেতে যেমন,
উছলি উছলি চলে।

রতি নিকটে বসিয়া ফুল গাঁথিতেছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া রতি বলিলেন—তুমি বীরপত্নী, তোমার এত ভয় কেন? তখন

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
'বীর পত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে!

পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয়।
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধ পণ।
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন ?

পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!'

কহিয়া এতেক উঠি অন্য মনে,
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি॥

'এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি'
বলি কোন পুষ্প তুলে;
'এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ'
বলি তাহে বৈসে ভুলে।
'এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার,
তুলি এই সারসন।

কহিলা সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ ॥'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন
শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্ধ কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ।
অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি !
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কতদিন
হেরে প্রিয় ফুল্ল মতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্প শর
ফেলিলা আমার গায়।
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ,
প্রিয়কর কত দিন,
না পরশে ইহা, সমর রঙ্গেতে
রত তিনি অনুদিন ॥
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার,
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !

আমিও রমণী,　　রমণীও শচী,
　তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া,　　হইয়া নিষ্ঠুর
　ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর,　　পতি কাছে নাই,
　মহাবীর পতি মম।
আমিও যদ্যপি　　পড়ি সে কখন
　বিপদে শচীর সম।'

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। 'আমিও রমণী, রমণীও শচী' ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শত পৃষ্ঠা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

শচীকে ধরিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, শাশুড়ীর উপর ইন্দুবালার রাগও মধুর।

ঐন্দ্রিল-দুহিতা　　সেবিতে কিঙ্করী
　স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী　　দানব-মহিষী
　দাসী চাহি ভ্রমে সেহ।
আমারে না কেন　　কহিলা মহিষী,
　আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর　　সাধের ভাণ্ডার
　শচী না সেবিলে পায় ?

রতির মুখে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা বলিতেছে,

আমারে লইয়া, কন্দর্প কামিনী,
চল সে পৃথিবী 'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ॥

ইন্দুবালা মর্ত্যালোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, দেবব্যূহ ভেদ করিয়া মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে। তখন ইন্দুবালার স্মরণ পড়িল যে তাঁহার স্বামীকেও যুদ্ধ করিয়া মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে। ইন্দুবালা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। আমরা সে ভাগ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলতা তাহাতে অতি সুন্দর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সরলতাই ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী শক্তির মূল। কবির চিত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাও ব্যক্তব্য যে, যে সরলতা তিনি ইন্দুবালার চরিত্রের মূল স্বরূপ করিয়াছেন, সে সরলতা আর কোন নায়িকার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেন

নাই। শচীতে, চঞ্চলায় বা ঐন্দ্রিলায় সে সরলতা নাই।' এইরূপে তিনি চরিত্রসকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

ইন্দুবালাকে রতি শান্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহাতে অপূর্ব্ব কবিত্ব। সেই সরলতার সঙ্গে কবি অতি গুরুতর গাম্ভীর্য্যের সূত্র জড়াইয়া দিতেছেন;—ইন্দুবালার চরিত্রে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে,—

পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা।
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হবে বুঝি শেষ স্থির।
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী।
কত পিতা পুত্রহীন।
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ।
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে?

দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে।'

কুলশক্র দেবতার জন্য এই কাতরতা—'কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে!' এই চারিটি শব্দে হেমবাবু রমণীচরিত্রের সরলতা, মাধুর্য্য ও মহত্ত্বের সীমা দেখাইয়াছেন।

তখন রতি বলিতেছে,—

'হায়, ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন।
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?

তখন পতিনিন্দায় ইন্দুবালা গর্জ্জিয়া উঠিয়া রতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,

শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে
বীর তিনি রণ-প্রিয়।
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়॥
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি।

মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী ॥
মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস ;
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস ॥
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল
থাকিবে অমনি ঢালা,
এবে গুটাইয়া, আরও সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা ;
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে ॥
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"

তখন রতি যে কয়টি কথা বলিতেছে, তাহা মর্ম্ম-বিদারক,

এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্পহার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?

আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে।
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পুজিলে লাগে।
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বাঁধিয়া পায়।
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায়।"

এই বলিয়া রতি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। ইন্দু-বালাও কাঁদিতে লাগিল,

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল,
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ার দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব,
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুলমালা হাতে, ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়॥

নবম সর্গ। এই সর্গে নৈমিষারণ্যে জয়ন্তের সহিত' রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ ও শচীহরণ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই সর্গের পরিচয় দিব।

"নবম সর্গ বীররসপ্রধান। বাত্যামথিত সাগরবৎ এই সর্গ, অবিশ্রান্ত ভীম গর্জ্জন করিতেছে। নৈমিষে জয়ন্ত সঙ্গে শচী কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে রুদ্রপীড় আসিল,

হেনকালে রণশঙ্খ, মৃগেন্দ্র শ্রুতি আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়, কাঁপিয়া অচল চয়,
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

কিঞ্চিৎকাল প্রাচীন প্রথানুসারে বাগ্‌যুদ্ধের পর, রুদ্রপীড় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন্ যোদ্ধার সঙ্গে জয়ন্ত যুদ্ধে ইচ্ছুক। তখন জয়ন্ত শত অসুরকে এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি। জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার যুদ্ধবর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ, দেব দৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।

অন্দোলিত হয় সৃষ্টি, সুরাসুরে শর বৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ ॥
ক্ষেপণ, মুষল শল্য, প্রক্ষেড়ন, চক্র ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি. চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা।
কেশরী শার্দ্দূল-দল, শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গে জড়ায়ে পাখা, ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর ॥

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন, অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত, শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃ স্থল ॥

ধরাতল টল টল, নদীকূল কল কল,
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শৃঙ্গ, শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন ॥

হেন যুদ্ধ দেবাসুরে, হয় অৰ্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ কিম্বা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি ॥

যথা সে অতল বাসী, তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃ-পতি জলে, ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত প্রায় দেহের প্রসার ;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি, আবার ফেলে উগারি,
দূর অন্তরীক্ষে বেগে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ, অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস ॥
কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি, মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা ;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ, দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব
বেগে দীপ্ত গিরিকায়, বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব ॥
জয়ন্ত তেমতি বলে দানব-যোদ্ধার দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীমদাপে।

তখন সূর্য্যাস্ত দেখিয়া এবং নবতি যোদ্ধা হত দেখিয়া রুদ্রপীড় বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। উভয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রে শচী ও চপলা বিশ্রামশীল জয়ন্তকে দেখিয়া যে

কথোপকথন করিলেন, তাহা অতি সুমধুর। প্রভাতে জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ কামনা করিলেন। শচী অন্তরে অমঙ্গল সূচনা দেখিয়া, জয়ন্তকে অনুদেবের স্মরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বীরধর্ম্মাশ্রিত জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে গেলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত কথিত হইয়াছে।

অর্দ্ধ দিবা যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচজন দানব বধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রুদ্রপীড় তাঁহাকে ঘোরতর আঘাত করিল।

না সহি দুর্ব্বহ ভার, অচল বিজলি হার,
বিচ্ছিন্ন হইল যেন, পড়িল তেমন।
কিম্বা যেন রাশীকৃত চন্দ্ররশ্মি আভা-স্রুত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন।
শিরীষ-কুসুমস্তর, যেন বা অবনী' পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি, নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন।

শচী আসিয়া পুত্র-দেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

না পড়ে চক্ষের পাতা, যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তর মূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন।

দেখিয়া, রুদ্রপীড়, শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কিন্তু নিকন্ধর নামে এক পামর অনুচর সঙ্গে ছিল; শচীহরণ জন্য তাহাকে অনুমতি করিলেন। নিকন্ধর শচীর কেশ ধরিয়া তুলিল—

হায় মত্তগজ যথা, ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর
দানব করেতে তথা, নিবদ্ধ কুন্তল-লতা
তুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর।

দৈত্যগণ, স্তম্ভিতা শচীকে কেশে ধরিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল। স্বর্গদ্বারে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শচীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন শচী উচ্চৈঃ রে কাঁদিতে লাগিলেন; সেই রোদন মর্ম্মভেদী তূর্য্যধ্বনিবৎ। শুনিয়া ত্রিলোকের জীব কাঁদিল। এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়া দেখিলেন দেবগণ সমরে পরাভূত হইয়াছেন,—

রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে, আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব তনু কিরণ প্রকাশি,
দিনান্তে নদীর জল, ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

সর্গশেষে একটি চমৎকার ছত্র আছে। শচীদেহ, অসুর বৃত্রসভাতলে আনিল। দেখিয়া, দৈত্যপতি,

চমকি সম্ভ্রমে উঠি যেন দাঁড়াইল।"

দশম সর্গ। দশম সর্গারম্ভে ইন্দ্রের কৈলাসপুর যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দীর্ঘ বর্ণনাটি সমগ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিলাম না। কৈলাসে শঙ্কর ও উমা অতি গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সকল সমাচার জ্ঞাপন করিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ শিবের জটা কম্পিত হইল, ইন্দ্রের হস্ত হইতে কার্ম্মুক স্খলিত হইল, গৌরীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। শচীর ক্রন্দন কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শচীর ক্রন্দন শুনিয়া ইন্দ্র দ্রুতবেগে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, শিব তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। ইন্দ্র তখন মহাতেজোময় দৃপ্ত বাক্যে শঙ্করকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। মহাদেবও বৃত্রের আচরণে রুষ্ট হইয়া সহসা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কায় পার্ব্বতী তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে বদরী আশ্রমে দধীচির নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে বৃত্রবধের জন্য বজ্র সৃষ্ট হইবে।

একাদশ সর্গ। স্বর্গে দৈত্যগণের বিজয়োৎসব। বৃত্র ও বৃত্রপুত্র উভয়ে পরস্পরের যুদ্ধবিজয় সংবাদ কহিতে লাগিলেন। শচীর আনয়ন সংবাদে ঐন্দ্রিলা আনন্দিতা হইয়া পুত্রকে তাঁহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর প্রশংসা করিলেন। ঈর্ষা-পরায়ণা ঐন্দ্রিলা পুত্রের মুখে শচীর প্রশংসা শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই স্বামীকে আদেশ করিলেন যে তখনই শচীকে আনাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হউক—

অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"

দেবরাণীর অবমাননা করিবার এই সঙ্কল্পের কথা ঈশানী মহাদেবকে জানাইলেন। তখন

"———মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগন মণ্ডল;
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ,
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন,
সংহার ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোম মার্গে ভাস্করের রথ,
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ,

বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কম্পিত,
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ,
ভয়েতে ভুজঙ্গ কুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমান মার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতি প্রাপ্ত জড়ে,
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয় ,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় ,
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু-শিখর ,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ ,
রুদ্রপীড় অঙ্গে হৈল লোম হরষণ ,
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি চিহ্ন" বলিয়া উঠিল ॥"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "এইখানে, অদৃষ্টের বিষময় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথমখণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্য যে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেমবাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি।"

বৃত্রসংহারের অপূর্ব্ব সমাদর। কবির আনন্দ ও উৎসাহ। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মহাশয় বলেন, "মেঘনাদবধ প্রকাশের সময় কি হইয়াছিল তাহা জানিনা, কিন্তু যখন বৃত্রসংহার প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সাহিত্য-জগতে যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা বেশ স্মরণ আছে।" হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন, "এরূপ কাব্য সর্ব্বদা জন্মে না।" মেঘনাদবধ কাব্যের গুণও যেরূপ অসাধারণ, দোষও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। বৃত্রসংহারের প্রেক্ষাবান্ কবি সমুচিত সতর্কতা ও সমীক্ষ্যকারিতার সহিত মেঘনাদ-বধ কাব্যের দোষগুলি পরিহার করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র সুখ্যাতিপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে লিখিয়াছিলেন, "আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এবং কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।" অন্যান্য সমা-লোচকগণও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সমস্বরে এই কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ১২২ সংখ্যক "কলিকাতা রিবিউ" ত্রৈমাসিকে এই কাব্যের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। উহার প্রারম্ভে দত্তজ মহাশয় এইরূপে কবির পরিচয় দেন :

"The author is well-known to the Bengali reading public as a poet of considerable talent and of a fine vigorous imagination. Among the living poets of Bengal he is second to none, and his shorter lyrical pieces are spirited and truly poetical, and are much appreciated by the public."

অতঃপর কাব্যখানির সুবিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়া ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের নিকট কবির ঋণ সম্বন্ধে দত্তজ মহাশয় উপসংহারে লিখিলেন :

"We have dwelt in detail on the contents of this poem as it is one of the most remarkable books lately published. It is something more, it has a representative character. It fairly represents the highest efforts of the Bengali intellect of the present day. It shows how much Bengali literature is borrowing from the

English, how the best original works in Bengali are replete with English ideas. The story is properly chosen from Hindu mythology, but the descriptions, the ideas, are—as the author admits in the preface—mostly English. And this is as it should be. There can be no question but that Bengali literature, though itself of several centuries' standing, is still vastly inferior to the English, and there is no reason why the advanced intellect of Bengal should not borrow from the English to enrich its mother tongue, just as the English writers borrowed from the Italian in the 14th, 15th and 16th centuries."

কঠোর সাধনার পরে যখন সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হয়, তখন সাধকের মনে কি উৎসাহের—কি আনন্দের আবির্ভাব হয়! 'বৃত্রসংহার' প্রথমখণ্ডের অপূর্ব্ব সমাদরলাভের পর হেমচন্দ্রের মনেও গভীর আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তিনি অসীম উৎ-

সাহ ভরে বৃত্রসংহারের উত্তরার্দ্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সরস্বতীর স্মিতাননের শুভ্রজ্যোতিঃ যখন তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হইল তখন তিনি সমস্ত ভুলিলেন। হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকীল হেমচন্দ্রকে কমলা যে বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ দ্বারা প্রলোভিত করিতেছিলেন, কবি হেমচন্দ্র সেই 'মণিময় ধূলিরাশি' উপেক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও একনিষ্ঠায় সহিত সরস্বতীর অর্চ্চনার জন্য,—তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য—ব্যগ্র ও উন্মত্ত হইলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন—

"বৃত্র সংহার সুরু হইলে তাঁহার ওকালতীতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না, হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।"

আচার্য্য কৃষ্ণকমল-কথিত ঘটনার ন্যায় আরও অনেক ঘটনার কথা আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহা এস্থলে লিপি-

বদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। হেমচন্দ্রের এই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সাহিত্য-সেবকগণের আদর্শ হইবার যোগ্য। বীণাপাণির অর্চ্চনার জন্য কমলার এরূপ প্রত্যাখ্যান জগতের ইতিহাসে বিরল। সে চিত্র আমাদের এই অযোগ্য তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি, আদিকবি বাল্মীকিকর্ত্তৃক কমলার প্রত্যাখ্যানের যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা পাঠকগণকে সেই চিত্র স্মরণ করিতে অনুরোধ করি,—

"কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি
ফুটুক তবে হাসি, মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে, হের গো চোখে।"

"(আমার) কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা।
তুমি ত নহ সে দেবী, কমলাসনা—
কোরোনা আমারে ছলনা।
কি এনেছ ধন মান। তাহা যে চাহেনা প্রাণ,
দেবি গো, চাহিনা, চাহিনা মণিময় ধুলিরাশি চাহিনা,

তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি দেবি, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসনা এসনা, এসনা এ দীনজন কুটীরে।
যে গান শুনেছি কাণে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহিনা চাহিনা।"

বাঙ্গালী পাঠকগণ অবগত আছেন যে কবিবর হেমচন্দ্রের সেই একাগ্র সাধনা জয়যুক্ত হইয়াছিল। আদি কবি বাল্মীকির ন্যায় 'ভারতসঙ্গীত' ও 'বৃত্রসংহারের' মহাকবির উপরেও দেবী সরস্বতীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বর্ষার বারিধারার ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হইয়াছিল।

"তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন।
সে রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে. সেথা তোর নাম র'বে।
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।

সে জাহ্নবী বহিবেক অমৃত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া।
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার।
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।